সঙ্কর্ষণ রায়

অষ্টভূজার রহস্য

সঙ্কর্ষণ রায়

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

ASTABHUJAR RAHASYA

A Story written by—Sankarshan Roy

প্রকাশক ঃ
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ—
বইমেলা—১৯৯৫

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ ঃ
পাথর প্রতিম বিশ্বাস

মুদ্রক ঃ
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৭৩

মূল্য ঃ ২০·০০

।। এক ।।

পুকুরের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়াই। একটা প্রকান্ড গোসাপ। পুকুরপাড়ে ভুঁইচাঁপার ঝোপের পাশে পড়ে আছে। লেজের ডগা থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত লম্বায় প্রায় সাত ফুট। চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে, মাটির মতো গায়ের রঙ, বীভৎস শরীরের গড়ন, দেখে মনে হয় যেন জাপানী রূপকথার ড্রাগন বইয়ের পাতা থেকে বেরিয়ে এসেছে। ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ কাঁপে, এর চেয়ে ভয়ঙ্কর যেন কখনো কিছু দেখিনি। সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার কথা মনে হলেও মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে থাকি তার দিকে তাকিয়ে।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে দেখি যে গোসাপটিও একদৃষ্টে ভুঁইচাপার ঝোপের মধ্যে কি যেন দেখছে। দেখা নয়, যেন অগ্নিবাণ ছুঁড়ে মারা। চোখ দুটি থেকে এক জোড়া তীর বেরিয়ে এসে যেন কাকে বিঁধে ফেলছে। নিঃশ্বাস আটকে আসে আমার...বুকের মধ্যে শিহর জাগে...হৃদপিণ্ডে দামামার শব্দ...রুদ্ধশ্বাসে যেন কোনো চূড়ান্ত ঘটনার জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকি...

বেশিক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হয় না, ঘটনা সত্যি ঘটে। ভুঁইচাঁপার ঝোপের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে একটা লিকলিকে বেতের মতো সবুজ রঙের লাউডগা সাপ, নিবিড় সবুজ ভুঁইচাঁপার পাতাগুলিই যেন সাপের আকার নিয়ে বেরিয়ে আসে। বেরিয়ে এসে সোজা গোসাপটির দিকে এগিয়ে যায়। এগিয়ে যায়, না গোসাপটি তাকে টেনে নিয়ে আসে ঠিক বুঝতে পারি না। সে গোসাপটির কাছে আসতেই খাপ থেকে ছোরার মতো তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে সরু লিকলিকে লম্বা জিভ। পরমুহূর্তে লাউডগা সাপটির সঙ্গে ঐ জিভের সংযোগ ঘটে...তারপর সাপটি ঢুকতে শুরু করে গোসাপের মুখের মধ্যে...

এমন সময় কে যেন আমার পিঠে হাত রেখে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি, আমাদের মাঝি সৈয়দ আলী। আমি তার দিকে তাকাতেই সে একগাল হেসে বললে, 'গুইল সাপের নাস্তা দ্যাহ নাকি? নাস্তাখান তো ভালই বাগাইছে!'

'গোসাপ সাপ খায়!' আমি ক্ষীণস্বরে বলি।

'হ, খায়।' সৈয়দ আলীর জবাব, 'তুমি যেমন মুড়ি-গুড়-দুধ খাও, আমি খাই পান্তা, গোসাপ তেমন সাপ খাইয়া নাস্তা সারে...'

'উঃ, কী সাংঘাতিক!'

'সাংঘাতিক কারে কও। তোমাগো ইলসা মাছের জুল (ঝোল), গোস্ত্ খাওনের মতোই হ্যার (ওর) সাপ-খাওন, তার মধ্যে সাংঘাতিক তো কিছু নাই। ঐ দ্যাহ, খাওন সাইরা চলল ঘাটলার দিকে।'

ঘাটলা মানে পুকুরের ঘাট। ঘাটের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ ঝোপঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হলো, বোধহয় মাটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন কোনো গহ্বরের মধ্যে পড়ল ঢুকে।

গুইল সাপের নাস্তা দ্যাহ নাকি?

গোসাপটি অদৃশ্য হতে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এগিয়ে যাই। আমার গন্তব্য পুকুরের পাশে খালের ধারে জামরুল গাছ। জামরুল গাছের নিচে বাঁধা আছে আমাদের নৌকো। জামরুল গাছ থেকে ঝরে পড়া জামরুল ফলে রোজই ভরে উঠত নৌকোর খোল, রোজকার মতো আজ সকালেও আমি তাই কুড়িয়ে আনতে যাচ্ছি।

'নৌকার থনে জামরুল টোকাইয়া আনতে আমিই পারুম—তুমি এ্যালা বড়কর্তার কাছে যাও, তেনি তোমারে ডাকতাসেন।'

'জ্যাঠামশাই আমাকে ডাকছেন! কিন্তু কেন?'

'তোমারে নিয়া তেনি এই নৌকাৎ কইর‍্যা জপসার দিকে যাইবেন। নাস্তা-পানি সারছ তো? গুইল সাপের নাস্তা দেখতাছিলা, নিজের নাস্তা নি হইছে?'

'হ্যাঁ, হয়েছে। একটু আগে রাঙাদি ফ্যানাভাত ও আলুসেদ্ধ খেতে দিয়েছিল, তাই খেয়ে এই পুকুরপাড়ে এসেছি।'

'তয় আর দেরি না কইর‍্যা কর্তার কাছে যাও। আমি নৌকাটারে ঠিকঠাক কইর‍্যা লই। বয় (ভয়) নাই, তার আগে তোমার জামরুলগুলান টোকাইয়া আমার গামছায় বাইন্দা রাখুম।'

পুকুরপাড় থেকে বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে আমার ছোট ভাই বাচ্চুর দেখা পেলাম, সে বললে, 'কই, জামরুল কুড়িয়ে আনলি না?'

'সৈয়দ আলীভাই কুড়িয়ে আনছে।' আমি জবাব দিলাম, 'এখন জ্যাঠামশাইয়ের কাছে যাচ্ছি—তিনি আমাকে নিয়ে কোথায় নাকি যাবেন, সৈয়দ আলীভাইকে নৌকো তৈরি করতে বলেছেন।'

'বেড়াতে যাবেন তোকে নিয়ে। বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে তোকেই বেছে নিয়েছেন, ভারি মজা তো তোর!'

উঠোনের চারপাশে ছটা চাটাইয়ের বেড়া ও টিনের ছাদ দেওয়া ঘর, এই হলো আমাদের বাড়ি। পুব বাংলার (অধুনা বাংলাদেশ) ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমায় কীর্তিনাশা নদীর ধারে জপসা একটা বড় নদী-বন্দর ও গঞ্জ। তার কাছেই (মাইল দেড়েকের মধ্যে) আমাদের গ্রাম 'নগর'। 'নগর' নামেই নগর, আসলে খুবই ছোট গ্রাম, মাত্র দশ-বারোটা বাড়ির সমষ্টি। আমাদের বাড়ি গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে খালের ধারে। এই খাল গিয়ে পড়েছে কীর্তিনাশা নদীতে জপসার ধার দিয়ে। জপসার স্টিমার থেকে নেমে নৌকো করে এই খালপথে আমরা বাড়ি এসে পৌঁছেছি। কলকাতা ছেড়ে এসেছি। পালিয়ে এসেছি বলা চলে, কারণ তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্কটলগ্ন, বোমার ভয়ে কলকাতা শহরে থাকতে তখন কেউই ভরসা পাচ্ছে না। 'ভয়' অবশ্য বড়দেরই, যে কোনো পরিস্থিতিতে ছোটরা সাধারণত অকুতোভয়।

মজার ব্যাপার এই যে, যে বড়রা আমাদের কলকাতা থেকে দেশের গ্রামে পাঠিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা নিজেরা কলকাতা ছাড়তে পারলেন না—চাকরির দায়ে তাঁরা কলকাতায় থেকে যেতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁদের ভয়ের ঠেলায় আমরা নারী-বৃদ্ধ-শিশুর দল নির্বাসিত হলাম পুব বাংলার এই গণ্ডগ্রামে। প্রথম প্রথম খারাপ লাগলেও এখন ভালই লাগছে, কারণ নিজের দেশের মাটির কাছাকাছি থাকার একটা আলাদা আনন্দ আছে।

সবচেয়ে বড় আনন্দ অবশ্য খাল-বিল-নদীতে নৌকো করে ঘুরে বেড়ানো। জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে এ হেন পর্যটনের সম্ভাবনায় মনে মনে পুলকিত হয়ে উঠি। আমার ছোট ভাইবোন

ও ভাগ্নে-ভাগ্নীদের ঈর্ষাকাতর দৃষ্টি আমাকে বিঁধতে থাকে, তারা মনে করে আমার মতো সৌভাগ্যবান বুঝি পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

আমাদের বাড়ির উত্তরের ঘরটি হলো জ্যাঠামশাইয়ের ঘর। সেখানে জামা-কাপড় পরে তামাক খেতে খেতে তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'আর দেরি নয়, চল্ এখনই বেরিয়ে পড়ি—সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসতে হবে তো!'

'কোথায় যাব আমরা?' আমি প্রশ্ন করি।

'জপসা।' জ্যাঠামশাই জবাব দিলেন, 'ছয় হাবেলির মধ্যে অষ্টভুজার মন্দিরটি কোথায় ছিল তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব।'

ছয় হাবেলি মানে ছটি অট্টালিকা। পাশাপাশি ছটি অট্টালিকা ছিল জপসার কাছে কীর্তিনাশা নদীর ধারে। কীর্তিনাশা হঠাৎ ভাঙনের লীলায় মেতে ওঠায় ছটি অট্টালিকাই ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। ছটি অট্টালিকার একটি ছিল আমাদের। কাজেই ছয় হাবেলি সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কৌতূহল ও আগ্রহ রয়েছে। জ্যাঠামশাইয়ের আগ্রহ অবশ্য ভিন্ন ধরনের, কারণ তিনি ছিলেন ঐতিহাসিক। ঢাকা জেলার একটা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখেছিলেন তিনি। নদী-খাল-বিল-জলা দিয়ে আচ্ছন্ন পুব বাংলার ইতিহাসের অধিকাংশ উপকরণ মাটিতে মিশে আছে, তাদের পুনরুদ্ধার করেছিলেন অসাধারণ অধ্যবসায়ের সঙ্গে। চোখে পড়ার মতো পুরাকীর্তির সন্ধান কদাচিৎ পেয়েছেন, অনেক কষ্টে সংগ্রহ করেছেন পুরোনো পুঁথি, প্রাচীন মুদ্রা ও শিলালিপি। স্থানীয় প্রবাদ, লোককথা এবং কিংবদন্তী থেকেও আহরণ করেছেন ইতিহাসের উপকরণ। ঢাকার ইতিহাস লেখার কাজ তিনি সম্পূর্ণ করলেও এই 'ছয় হাবেলি' নিয়ে তাঁর গবেষণা শেষ করতে পারেননি। একটানা চল্লিশ বছর ধরে সন্ধান নিয়েও ছয় হাবেলি ঠিক কোথায় ছিল তার হদিস তিনি এখনও (মানে ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত) পাননি। অথচ মজার ব্যাপার এই যে, এই ছয় হাবেলি তাঁর বাল্যকালে তাঁর চোখের সামনেই কীর্তিনাশার কুক্ষিগত হয়েছিল।

ছেলেবেলায় যাকে ভেঙে পড়তে দেখেছেন, বড় হয়ে তার হদিস না পাওয়ার মূল কারণ ছয় হাবেলিসুদ্ধ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের একটা সুদূরপ্রসারী বালির চড়ায় পরিণত হওয়া। দিকচিহ্নহীন বালির মধ্যে ছয় হাবেলির অবস্থান নির্ণয় করতে এ পর্যন্ত না পেরে থাকলেও তিনি চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছেন। আজও সেই চেষ্টারই পুনরাবৃত্তি হবে। তবে আজকের সন্ধানপর্বের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে তিনি আজ ছয় হাবেলির মধ্যে অষ্টভুজার মন্দিরটিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন। ছয় হাবেলিরই হদিস জানা নেই, ছয় হাবেলির অঙ্গীভূত অষ্টভুজার মন্দিরটিকে তিনি খুঁজে বের করবেন কি করে তা আমি ভেবে পেলাম না। ভেবে পেলাম না বলে আমার মুখে মৃদুমন্দ হাসি ফুটে ওঠে।

'হাসছিস কেন?' জ্যাঠামশাই আমার মুখের ওপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে প্রশ্ন করেন।

'এমনই।' আমি জবাব দিলাম, 'হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল কিনা...'

'অকারণে হঠাৎ হাসি পেয়ে যাবে, এ তো হতে পারে না—বল কেন হাসলি?'

কেন হাসলাম বলতে গিয়ে আমার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। একটু কেশে ঢোক

আলী একগাল হেসে বললে, 'নাও তৈয়ার কর্তা।

গিলে বলি, 'ছয় হাবেলিরই হদিস নেই, অষ্টভুজার মন্দির খুঁজে পাবেন কি করে ভাবতে গিয়ে আমার হাসি পাচ্ছিল।'

'হাসি পাবারই কথা।' জ্যাঠামশাইয়ের মুখেও মৃদু হাসি ফুটে উঠলঃ 'কিন্তু অনেক

সময় ছোটখাটো জিনিস এমন কিছু চিহ্ন রেখে যায় যা বড় জিনিসের হদিস দিতে পারবে। কীর্তিনাশার চরের মধ্যে তেমন কিছু আছে কিনা তাই দেখতে চাই।'

'আগে তো অনেক দেখেছেন, চরের মধ্যে অনেকবার খোঁজাখুজি করেছেন....'

'তা করেছি। কিন্তু এমনও তো হতে পারে, কিছু একটা হদিস হয়তো রয়ে গেছে যা আমার চোখে পড়েনি। যদিও চোখের নজর আর তেমন নেই, তবু... বলা তো যায় না... তা ছাড়া তোকে সঙ্গে নিয়ে তো যাচ্ছি...হয়তো তোর নজরে তেমন কিছু এসে যেতে পারে...'

এমন সময় ঘরে এসে ঢুকল আমাদের দিদিমণি। কলকাতায় উইমেন্স কলেজে বি. এ. পড়ত, এখন গাঁয়ের মেয়েদের নিয়ে স্কুল করেছে গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে। চণ্ডীমণ্ডপ ও তার লাগোয়া দুটি ঘর নিয়ে সে গড়ে তুলেছে তার 'নগর বালিকা বিদ্যালয়'। তার সঙ্গে সহযোগিতা করছে আমাদের জ্যাঠতুতো বোন রাঙাদি এবং গ্রাম সম্পর্কে দিদি অন্নপূর্ণাদিদি। দিদিমণি তার স্কুলের জন্য তৈরি হয়ে পান খাবার জন্য জ্যেঠিমার কাছে এসে জ্যাঠামশাইকে বললে, 'কাল সারারাত হাঁপানিতে কষ্ট পেয়েছেন, আজ নাই বা বেরোলেন জ্যাঠামশাই।'

'না রে না, বেরোতে হবেই।' লাঠি হাতে উঠে দাঁড়ালেন জ্যাঠামশাইঃ 'সেই টমাস ছেলেটা আবার চিঠি লিখেছে। যুদ্ধের ডিউটিতে সে দিল্লীতে এসেছে, লিখেছে যে শীগগিরই এসে তার কাজ সেরে ফেলবে...'

অবাক হয়ে জ্যাঠামশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'টমাস কে জ্যাঠামশাই? কিসেরই বা কাজ তার এখনে?'

'চল, যেতে যেতে বলছি।' লাঠি ঠুকঠুক করে হাঁটতে শুরু করলেন জ্যাঠামশাই। খালপারে জামরুল গাছের তলায় সৈয়দ আলী নৌকোটিকে জলে ভাসিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল; জ্যাঠামশাই আমাকে নিয়ে সেখানে পৌঁছতেই সৈয়দ আলী একগাল হেসে বললে, 'নাও তৈয়ার কর্তা—এ্যালা চলেন।'

'জামরুলগুলোকে নিয়ে কি করলে সৈয়দ আলীভাই?' আমি উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করি।

'টোকাইয়া (কুড়িয়ে) আমার গামছায় বাইন্দা রাখছিলাম।' সৈয়দ আলী জবাব দিল, 'তোমার বাই (ভাই) আইসা লইয়া গেসে।'

সৈয়দ আলী ও আমি ধরাধরি করে জ্যাঠামশাইকে নৌকোতে তুলি। পাটাতনের ওপরে আসন পেতে বসে জ্যাঠামশাই সৈয়দ আলীকে নৌকো ছেড়ে দেবার আগে তামাক সেজে দিতে বললেন। তামাকের সরঞ্জাম আগেই নিয়ে এসেছিল সৈয়দ আলী, কলকেতে তামাক ও টিকা সাজতে সাজতে সে বললে, 'আপনের ওক্কাখান (হুক্কা) বড় জবর কর্তা। রূপার লাহান (মত) জলুস! এইটা পাইলেন কোইখেইকা (কোথা থেকে)?'

'আমার ঠাকুর্দার জিনিস। টমাস পাঠিয়ে দিয়েছে।' জ্যাঠামশাই জবাব দিলেন, 'খাঁটি রূপার জিনিস।'

'আপনার ঠাকুর্দার জিনিস টমাসের কাছে গেল কি করে?' আমি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করি।

'আমার ঠাকুর্দা তোমার প্রপিতামহ!' জ্যাঠামশাই কঠোর স্বরে বললেন।

'প্রপিতামহের আলবোলাটি টমাসের হস্তগত হলো কি করে জ্যাঠামশাই?'

'বলছি। সৈয়দ আলী নৌকো ছেড়ে দিলেই বলতে শুরু করব।'

রূপোর আলবোলার ওপরে নতুন কেনা কল্কেটি বসিয়ে জ্যাঠামশাইয়ের দিকে এগিয়ে দেয় সৈয়দ আলী। তারপর জামরুল গাছে বাঁধা দড়ি খুলে নৌকো ছেড়ে দিয়ে বললে, 'বদর, বদর.....গাজী.....গাজী....'

আমাদের বাড়ির সীমানা পেরিয়ে নৌকোটি জলার মধ্যে ঢোকে। কচুরিপানায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে জলার বড় একটা অংশ। জলার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে বুড়ো শিবের মূর্তি চোখে পড়ল। জলার ধারে বিপুল আকারের কালো রঙের পাথরের শিবলিঙ্গটি সত্যিই দেখবার মতো। এরকম প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ সারা ভারতে চার-পাঁচটির বেশি নেই। আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ বারাণসী থেকে এটাকে নিয়ে এসেছিলেন জপসার ছয় হাবেলিতে। ছয় হাবেলি ভেঙে নদীর কুক্ষিগত হওয়ার আগে একে নগরে নিয়ে আসা হয়।

নগর গ্রামের সীমা আমরা পেরিয়ে যেতেই জ্যাঠামশাই বললেন, 'নগর আসলে 'শ্রীনগর'। এখানে মোগল সেনাপতি কিমলককে যুদ্ধে পরাস্ত করে বন্দী করে রেখেছিলেন কেদার রায়।'

নগর গ্রাম পেরিয়ে 'ফতেজঙ্গপুর' গ্রামের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাই। 'ফতেজঙ্গপুরে'র ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে, কারণ এখানে কেদার রায়ের সঙ্গে রাজা মানসিংহের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল! যুদ্ধে কেদার রায়কে হারিয়ে দিয়ে মানসিংহ এখানকার নাম 'ফতেজঙ্গপুর' রেখেছিলেন।

ইতিহাসের এই রক্তাক্ত অধ্যায়ের কোনো স্মারকচিহ্ন এখন অবশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। নদী-খাল-বিল এখানকার পুরাকীর্তিগুলিকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে।

তামাক টানতে টানতে জ্যাঠামশাই বললেন, 'পুরাকীর্তিগুলি নিশ্চিহ্ন হয়েছে, তথাপি ঐতিহাসিকরা কীর্তিকলাপ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। 'ঢাকার ইতিহাসে'র উপকরণ খুঁজতে গিয়ে আমি নিজে মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া অনেক পুরাকীর্তির হদিস পেয়েছি। কিন্তু প্রাচীনকালের বহু লুপ্তধন খুঁজে বের করতে পারলেও মাত্র পঞ্চান্ন বছর আগে কীর্তিনাশা নদীর কুক্ষিগত বাড়ি ও মন্দিরের কোনো হদিসই পাচ্ছি না...'

আমি বললাম, 'জ্যাঠামশাই, টমাসের ব্যাপারে বলবেন বলেছিলেন...কেন সে আসবে এখানে... তা ছাড়া ঐ রূপোর আলবোলা...'

'ঐ রূপোর আলবোলা আমাদেরই জিনিস, সেটা সে ফেরত পাঠিয়েছে লণ্ডন থেকে। এখন যা ফেরত দিতে চাইছে, সে অনেক দামী জিনিস......'

'কি সেই জিনিস?'

'অষ্টভুজার চোখের মণি......দুটো বড় আকারের নীলা......'

॥ দুই ॥

তামাক টানতে টানতে জ্যাঠামশাই টমাসের বৃত্তান্ত সবিস্তারে বললেন।

টমাসের নাম টমাস রাইট। ইংল্যাণ্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক। মহাযুদ্ধ তাকে অধ্যাপনা থেকে যুদ্ধ-সংক্রান্ত কার্যকলাপে টেনে এনেছে, যুদ্ধের কাজের সূত্রেই সে সম্প্রতি দিল্লি এসেছে। তার ঠাকুর্দা আরভিন রাইট ছিলেন এ অঞ্চলের (অর্থাৎ মাদারীপুর মহকুমার) সাব ডিভিশন্যাল অফিসার। প্রলয়ঙ্করী বন্যায় উন্মত্ত হয়ে কীর্তিনাশা নদী যখন ছয় হাবেলিকে নাশ করতে উদ্যত, তখন তিনি তাঁর স্টিমারে করে জপসায় এসেছিলেন বন্যাপীড়িত মানুষদের ত্রাণের ব্যবস্থা করতে। রক্ষকের ভূমিকা নিয়ে এসে ভক্ষকের মতো আচরণ করলেন তিনি। ভাঙতে থাকা ছয় হাবেলি থেকে এই রুপোর আলবোলাটি নিলেন এবং জলে তলিয়ে যাওয়া অষ্টভুজার মন্দিরে ডুব সাঁতার দিয়ে ঢুকে তুলে আনলেন দেবী অষ্টভুজার নীলার চোখ দুটিকে।

তারপর বহু বছর কেটে গেছে। আলবোলা ও নীলা এখন আরভিনের নাতি টমাসের কাছে আছে। এগুলো আরভিন কিভাবে সংগ্রহ করেছিলেন তার বিবরণ শোনামাত্র টমাস উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল এবং তাদের ফেরত দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল। তার এই ব্যস্ততা আরভিনের কাছে হাস্যকর বলে মনে হলো, কারণ তাঁর ধারণা যে ছয় হাবেলির বাসিন্দারা ছয় হাবেলি ছেড়ে সারা বাংলাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাদের কারুরই হদিস পাওয়া সম্ভব নয়। টমাস তখন তার ঠাকুর্দাকে বললে যে এই অসম্ভবকে সে সম্ভব করে তুলবেই।

শেষ পর্যন্ত সত্যিই এ অসম্ভব সম্ভব হলো। ইতিহাস চর্চার ঝোঁকে সে বাংলা শিখে পড়ে ফেলেছিল আনন্দমোহন রায়ের 'ফরিদপুরের ইতিহাস' এবং জ্যাঠামশাইয়ের 'ঢাকার ইতিহাস'। এই বই দুটি পড়ে ছয় হাবেলির বাসিন্দাদের হদিস পেয়ে গেল সে এবং জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে পত্রালাপে প্রবৃত্ত হলো। সে তাঁকে লিখল যে সে তার ঠাকুর্দার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় অপহৃত জিনিসগুলিকে তাদের মালিকদের কাছে ফেরত দিয়ে। রুপোর আলবোলাটি আমার প্র-পিতামহের জানা মাত্র সে পার্সেল করে তা পাঠিয়ে দিয়েছে জ্যাঠামশাইয়ের কাছে। এখন তাঁকে সে অষ্টভুজার মূর্তিটিকে খুঁজে বের করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। মূর্তিটির সন্ধান পাওয়া মাত্র সে নীলা দুটি নিয়ে চলে আসবে। চক্ষুহীন দেবী যে চক্ষুমতী হয়েছেন তা সে স্বচক্ষে দেখতে চায়।

টমাসের কথা শেষ করে জ্যাঠামশাই বললেন, 'এখন মুশকিল হয়েছে এই যে অষ্টভুজার মন্দির বা দেবীমূর্তির কোনো হদিসই নেই। তবে মজার ব্যাপার কি জানিস, মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে মন্দির না থাকলেও নিয়মিত পুজো-আর্চা চলছে।'

'কোথায়?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'কীর্তিনাশার চরের মধ্যে এক জায়গায় বিধিসম্মতভাবে পুজো দেওয়া হয়। শ্যামাপদ গোস্বামী ছিলেন পুলিসের দারোগা, শুনেছি তাঁর উদ্যোগেই চলছে এই পুজা।'

খাল যেখানে কীর্তিনাশা নদীতে এসে মিশেছে, সেখানেই জপসা। জ্যাঠামশাইয়ের নির্দেশে সৈয়দ আলী নদী দিয়ে পুব দিকে নৌকা চালাতে থাকে। গঞ্জ, পাটের গুদাম, স্টীমার ঘাট ইত্যাদি ছাড়িয়ে আমরা এগিয়ে যাই। শীতের নদীর ধারা খুবই ক্ষীণ। দু'পাশে ধু-ধু করছে শুকনো বালি ও পলিমাটির চর—নদীর তুলনায় অনেক চওড়া। আগে এই নদীর আকার যে কি বিপুল ছিল, চরের আয়তন বিবেচনা করলেই বোঝা যায়।

নদীর মূল ধারা বেয়ে কিছুটা এগিয়ে গিয়েছি, এমন সময় জ্যাঠামশাই বললেন, 'নৌকা থামাও সৈয়দ আলী, এখান থেকে আমরা হেঁটে যাব।'

'হাইট্যা যাইবেন—কয়েন কী কর্তা!' সৈয়দ আলী শিউরে উঠে বললে, 'এই সর্বনাইশ্যা চরের মধ্যে হাইট্যা যাইবেন!'

'এই চরটা সর্বনেশে হলো কবে থেকে?' জ্যাঠামশাই প্রশ্ন করেন, 'এখানকার জমি উর্বর, ধান-পাট ছাড়া রকমারি শাকসবজি, ফলের চাষ করে এখানকার লোকেরা তো বড়লোক হয়েছে...'

'হইছে, কিন্তু আর হইব না। চাযারা আর এই চরের ধারেকাছেও আইব না।'

'কেন?'

'ক্যান তা মুখে কই কি কইর‍্যা। আযাঢ় মাস থেইক্যা এইখানে...'

বলতে বলতে থেমে যায় সৈয়দ আলী। তার ফ্যাকাশে মুখ, আর্ত চোখের চাউনি দেখে বোঝা যায় যেন ভয়াবহ কিছু তার নজরে এসেছে।

'কি হলো সৈয়দ আলী, হঠাৎ চুপ করে গেলে কেন?'

উত্তরে কিছুই বলতে পারে না সৈয়দ আলী, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে [illegible] চেয়ে থাকে।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে চরের মধ্যে একটি উঁচু ডাঙায় গাছপালাবেষ্টিত কয়েকটা ঘর দেখতে পাই।

আমি বললাম, 'ঐ ঘরগুলোর মধ্যে ভয়ঙ্কর কিছু আছে বুঝি সৈয়দ আলী? কোনো বাঘ কি ওখানে লুকিয়ে আছে?'

'বাঘের থেইক্যাও সাংঘাতিক জিনিস আসে। কর্তা বাইছ্যা বাইছ্যা ঐ সর্বনাইশ্যার ডেরার কাছে নৌকা থামাইলেন, এখন দ্যাহ (দেখ) তগ্‌দিরে (ভাগ্যে) কি আসে! কর্তা হুকুম করেন তো অহনই (এখনই) নাও ছুটাইয়া দেই এইখান থেইক্যা...'

'না।' জ্যাঠামশাই গুরুগম্ভীর গলায় বললেন।

'কি আছে ওখানে সৈয়দ আলীভাই?' আমি প্রশ্ন করি।

জ্যাঠামশাইয়ের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সৈয়দ আলী বললে, 'আসে এক স্বদেশী বাবু, ডাকাইতও কইথে পার। ইংরেজগো মারণের লেইগ্যা বোমা বানাইত। ঐ যাঃ, এইদিকেই আহে...কর্ম সারছে...'

সৈয়দ আলীর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি যে একজন ছিপছিপে চেহারার যুবক চরের মধ্য দিয়ে হেঁটে আসছে। পরনে তার মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবি ও পায়জামা—খুবই সুপুরুষ।

জ্যাঠামশাইয়ের উদ্দেশে হাতজোড় করে নমস্কার করে সে

যুবকটির চেহারার মধ্যে এমন কিছু ছিল না যা দেখে লোকে ভয় পেতে পারে। কিন্তু তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সৈয়দ আলীর চোখ দুটির আয়তন ক্রমশ বেড়ে উঠতে থাকে, যেন চোখের সামনে বিভীষিকা দেখছে।

যুবকটি ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে আমাদের দিকে। সৈয়দ আলী ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে থাকে এবং আপন মনে জপতে থাকে, 'আল্লা...আল্লা...'

যুবকটি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, মুখে তার স্নিগ্ধ হাসি।

জ্যাঠামশাইয়ের উদ্দেশে হাতজোড় করে নমস্কার করে সে বললে, 'আপনিই তো 'ঢাকার ইতিহাস'-এর লেখক যতীন্দ্রমোহন রায়?'

'হ্যাঁ।' জ্যাঠামশাই জবাব দিলেন, 'কিন্তু তুমি আমাকে চিনলে কি করে?'

'বছর কয়েক আগে কলকাতার ফেডারেশন হল ও মহাবোধি সোসাইটিতে আপনার বক্তৃতা শুনেছি। এখানে এসে যখন জানলাম যে আপনি নিকটেই আছেন, মনে মনে খুশি হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু খুশি হলেও ভেবে পাচ্ছিলাম না কি করে দেখা পাব আপনার! আপনি যে নিজেই এসে হাজির হবেন তা আমি কল্পনাও করিনি। আমার নিরুপায় অবস্থার কথা বিবেচনা করেই যেন ঈশ্বর আপনাকে আমার কাছে টেনে নিয়ে এসেছেন।'

'নিরুপায় অবস্থা কেন?'

'এখানে আমি পুলিসের নজরবন্দী, অন্তরীণ—এই চরের এলাকার বাইরে আমার যাওয়ার উপায় নেই। সামনে ঐ যে ঘরগুলি দেখছেন, ঐ ঘরগুলির একটিতে আমি থাকি।'

'ওটা তো শ্যামাপদ গোস্বামীর বাড়ি—শ্যামাপদবাবুর বাড়িতে থাক তুমি?'

'হ্যাঁ। আমি শ্যামাপদবাবুর অতিথি, আমার নাম অরুণাভ চক্রবর্তী, ডাকনাম অরুণ। শ্যামাপদবাবু পুলিসের দারোগাগিরি থেকে রিটায়ার করার পর আমাকে দেখাশুনা করার কাজ পেয়েছেন। দু'জন সশস্ত্র কনস্টেবল রয়েছে আমাকে পাহারা দেবার জন্য। ঐ যে ওরা এসে গিয়েছে। রাজুভাই, কালুভাই, এঁকে চেন তো?'

'চিনি না মানে! ইনি তো বড়কর্তা!' বলে মাটিতে লুটিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে রাজু ও কালু। প্রণাম করতে গিয়ে তাদের কাঁধ থেকে রাইফেল খসে পড়ে মাটিতে।

জ্যাঠামশাই হেসে ফেলে বললেন, 'কাজের সময় প্রণাম করে না... ওঠো, ওঠো...'

মুখ টিপে হেসে অরুণ বললে, 'রাজু, কালু, তোমাদের কাঁধ থেকে রাইফেল খসে পড়েছে, আমি ইচ্ছে করলেই ও দুটো তুলে নিয়ে তোমাদের দু'জনকে...'

'হে আপনি পারবেন না।' রাজু বললে, 'আপনি তো আমাগো বালবাসেন (ভালবাসেন)। যাগো বালবাসেন, তাগো মন্দ কি কখনো করতে পারেন!'

'নিশ্চয়ই না। তোমাদের কোনো ক্ষতি আমি কখনোই করতে পারব না। তোমরাও তো আমাকে ভালবাস, তাই না?'

'হ, বাসি।'

'ভালবাস বলেই কখনোই আমাকে একা ছেড়ে দাও না—তাই না?'

'কলাডা মূলাডাও তো আইন্যা দেই।'

'সে তো দারোগাবাবুকে এনে দাও।'

'দারোগাবাবুরে দিলেই তো আপনারে দেওন হয়। আপনি হইলেন গিয়া দারোগাবাবুর

অতিথ। বুঝলেন বোমাবাবু, আইজ 'সবরি' (মর্তমান) কলা আইন্যা দিসি। শুনলাম 'কবরি' (চাঁপা) কলা খাইতে নাকি আপনার ভাল্ লাগে না, তাই খুইজ্যা-পাইত্তা...'

'খুঁজে পেতে মানে তো কারুর বাগান থেকে তুলে এনে..'

আমি বললাম, 'এরা আপনাকে বোমাবাবু বলে সম্বোধন করছে, এতে আপনার আপত্তি জানানো উচিত।'

অরুণ হেসে ফেলে বললে, 'এই সম্বোধন দিয়ে এরা আমাকে সম্মানিত করছে, কাজেই আপত্তি জানানোর প্রশ্ন ওঠে না। সত্যিই আমি একজন বোমা-বিশারদ। আমার তৈরি করা বোমা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনেকেরই কাজে লেগেছে। আমার তৈরি করা বোমার ঘায়ে অন্তত পক্ষে পনেরো জন ইংরেজ খুন হয়েছে।'

'আপনি নিজে কি কাউকে...'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জ্যাঠামশাই বললেন, 'আচ্ছা অরুণ, এই সন্ত্রাস ও হিংসার পথ ভাল কিনা চিন্তা করে দেখছ কি?'

'না।' অরুণ জবাব দিল, 'চিন্তার কোনো অবকাশই নেই আমার। যে পথে এগিয়ে যাচ্ছি, সেই আমার পথ—নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। এখন, মানে এই অন্তরীণ অবস্থায় অবশ্য কিছুই করতে পারছি না, তবে ছাড়া পাওয়া মাত্র আবার এই পথেই এগিয়ে যাব, যতদিন না দেশ স্বাধীন হচ্ছে।'

'ঠিক আছে, নিজের মত ও পথে আস্থা অবিচল রেখে এগিয়ে যাও। কিন্তু এখন, মানে তোমার এই অন্তরীণ অবস্থায় কি করবে?'

'ইতিহাস-চর্চা। এখানে এসে অবধি করতে শুরু করে দিয়েছি। আপনার কাছ থেকেই অবশ্য তার প্রেরণা পেয়েছি। আপনার 'ঢাকার ইতিহাস' ও বক্তৃতা আমাকে কীর্তিনাশার এই বিশাল বালুচরে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রেরণা দিয়েছে। কীর্তিনাশা যে সব 'কীর্তি' নাশ করেছে, তাদের সব ক'টির হদিস তো মেলেনি। আমার ধারণা জপসার এই বালুচরে খুব বড় রকম কীর্তিকলাপ চাপা পড়ে আছে।'

'এই ধারণা তোমার হলো কি করে?'

'কি করে হলো তা আপনাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। যা বলব তা শুনলে হয়তো আপনার হাসি পাবে।'

'না, না, কক্ষণো না, আমি ঐতিহাসিক, কোনো কিছুই আমার কাছে তুচ্ছ না। খুব অবাস্তব ব্যাপারকেও আমি উড়িয়ে দিতে পারি না। বলো তোমার এই ধারণার ভিত্তি কি?'

'সুস্পষ্ট কোনো ভিত্তি তো নেই। মাঝে মাঝে এক একটা অনুভূতি হয় আমার, তখন সেই সব কীর্তিকলাপ যেন চোখে দেখতে পাই। এখানে বালুচরে ঘুরতে ঘুরতে মাঝে মাঝে চাপা কান্নার আওয়াজ শুনতে পাই। কারা যেন কেঁদে কেঁদে আবেদন জানাচ্ছে তাদের উদ্ধার করার জন্য। এসবের অবশ্য বুদ্ধিতে কোনো ব্যাখ্যা নেই, নিছক আমার কল্পনা হয়তো...'

'তোমার অন্তর্দৃষ্টিও বলতে পার। ইতিহাস-চর্চায় যাঁরা প্রবৃত্ত হয়েছেন তাঁদের পক্ষে

এই অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন আছে। ঢাকার ইতিহাসের উপকরণ খুঁজতে গিয়ে এ জাতীয় অন্তর্দৃষ্টি আমাকেও অনুসন্ধানের প্রেরণা জুগিয়েছে। মাটির তলা থেকে উঠে আসা চাপা কান্না অবশ্য তদন্তের অপেক্ষা রাখে, কারণ অলৌকিক বা ভৌতিক ব্যাপার বলে পৃথিবীতে কিছু নেই, সব কিছুরই বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা হওয়া উচিত। সে যাই হোক, তুমি যে কীর্তিনাশার এই চরের মধ্যে ঐতিহাসিক সমীক্ষার তাগিদ অনুভব করছ তাতে আমি খুবই খুশি হয়েছি। চরের মধ্যেই বাস করছ, অতএব তোমার পক্ষে এই সমীক্ষা চালিয়ে যাওয়া খুবই সহজ। ঘোরাঘুরি কর, একটা মানচিত্র তৈরি করে তাতে চিহ্নিত কর চরের ভেতরকার বালি ও পলিমাটির বিন্যাস, জলা ও বালির ঢিবি। চরের জীবজন্তুগুলোকেও লক্ষ্য কর ভাল করে।'

'নিশ্চয়ই করব।' অরুণ উৎসুক কণ্ঠে বললে, 'আপনি যা যা বলছেন সব অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। কিন্তু একটা কথা বলুন আমাকে, এই বালুচরের নিচে কি কি চাপা পড়ে আছে বলে আপনি অনুমান করেন?'

'অনুমান নয়, আমি জানি এখানে কি ছিল।' জ্যাঠামশাই জবাব দিলেন, 'এখানে আমাদের বাড়ি ছিল। পাশাপাশি ছটি অট্টালিকা, জপসার 'ছয় হাবেলি' নামে তারা পরিচিত ছিল। আজ থেকে প্রায় যাট বছর আগে কীর্তিনাশা নদীতে প্রচন্ড বন্যা হয়েছিল। তখন কীর্তিনাশার এই খাতের মধ্য দিয়ে পদ্মা নদীর মূল ধারাটি বয়ে যেত। এমনিতেই পদ্মা একটি প্রমত্তা নদী, তাতে প্রচন্ড বন্যা কতখানি প্রলয়ঙ্করী হতে পারে, আশা করি তা সহজেই অনুমান করতে পার। সেই বন্যার তোড়ে ভেঙে গিয়ে জলের মধ্যে তলিয়ে গেল ছয় হাবেলির প্রত্যেকটা হাবেলি। বন্যা শুরু হতেই আমরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাই। পরে বন্যার জল নেমে যাবার পর এখানে এসে একটা হাবেলিরও কোনো চিহ্ন খুঁজে পাইনি। অর্থাৎ কীর্তিনাশার বন্যা ছয় হাবেলিকে ধ্বংস করে পলিমাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল।'

আমি বললাম, 'ছয় হাবেলি তো ছটা প্রাসাদোপম বাড়ি। ছ' ছটা বাড়ি ছিল বুঝি আমাদের।'

'আমাদের ছয় শরিকের ছটা বাড়ি।' জ্যাঠামশাই জবাব দিলেন, 'আমাদের পূর্বপুরুষ গোপীরমণ সেন তাঁর ছয় ছেলের জন্য ছটা বাড়ি করে দিয়েছিলেন, সেই ছটা বাড়িই হলো ছয় হাবেলি।'

অরুণ বললে, 'আপনার কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে আপনাদের ছয় হাবেলিকে কীর্তিনাশা একেবারে নাশ করে দিয়েছে, তার কোনো চিহ্ন কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তাহলে ছয় হাবেলির জন্য এখানে খোঁজাখুঁজি করে কোনো লাভ আছে কি?'

'না, নেই। ছয় হাবেলি পুনরুদ্ধারের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবে ছয় হাবেলির সঙ্গে একটা মন্দির কীর্তিনাশার কুক্ষিগত হয়েছে, অষ্টভুজার মন্দির, সেই মন্দিরটিকে পুনরুদ্ধার করার জন্য তোমাকে অনুরোধ জানাই।'

অরুণ ব্যগ্রকণ্ঠে বললে, 'আপনি কি মনে করেন অষ্টভুজার মন্দিরটি ছয় হাবেলির মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি?'

‘খুব মজবুত পাথরের তৈরী মন্দির ছিল ওটা।’ জ্যাঠামশাই জবাব দিলেন, ‘ছয় হাবেলির মতো ভেঙে যায়নি বলেই আমার ধারণা। বোধ হয় পলিমাটির নিচে চাপা পড়ে আছে...’

‘কোথায় ?’

‘ছয় হাবেলির কাছাকাছি ছিল মন্দিরটা।’

‘কোথায় ছিল ছয় হাবেলি ?’

মৃদু হাসতে হাসতে জ্যাঠামশাই বললেন, ‘তোমার এ প্রশ্নের একমাত্র যে জবাব আমি দিতে পারি তা হচ্ছে ছয় হাবেলি ছিল ঐ মন্দিরের কাছে। আসল কথা হচ্ছে এই যে ছয় হাবেলি কোথায় ছিল তা আমি এখন বুঝতে পারছি না। কীর্তিনাশার সেই বন্যার পর এখানকার ভূগোলে গন্ডগোল দেখা দিয়েছে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ পালটে গিয়েছে এখানকার ভূবিন্যাস। এই যে মরুভূমির মতো বিস্তীর্ণ বালুচর দেখতে পাচ্ছ, তার এক-তৃতীয়াংশ ছিল না বন্যার আগে। এই চরের অধিকাংশ সেই বন্যার সৃষ্টি।’

‘নিজের চোখে আপনি ছয় হাবেলিকে ভাঙতে দেখেছেন, আপনার কি কিছুতেই মনে পড়ে না...’

‘না। তবে এই চরের ওপরে ঘোরাঘুরি করে মনে করার চেষ্টা করতে পারি...’

‘তা হলে আসুন...’

‘বড়কর্তার আর আইয়া কাম নাই।’ রাজু মন্ডল বাধা দিয়ে বললে, ‘আর আপনেরও এহন (এখন) ঘোরন চলব না। চলেন এইখান থন (এখান থেকে)।’

‘রাউজ্যা।’ হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে ডেকে উঠল কালু মিঞা।

‘কিরে কাউল্যা।’ রাজু জবাব দিল।

‘ঐ যে আহে আমাগো তালাসে...চল্, শীগগির চল্...’

‘কে আহে-দারোগাঠাকুর ?’

‘না রে—আহে (আসে) দারোগারও দারোগা...ঐ দেখ্...’

॥ তিন ॥
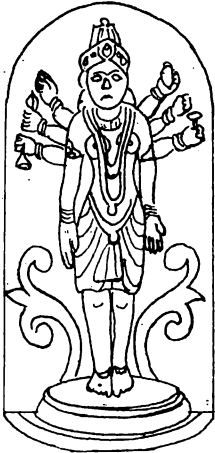
দারোগারও দারোগা বলে কালু যাকে অভিহিত করে, সে একজন তরুণী। সুশ্রী, শ্যামবর্ণা, বয়স বিশ-বাইশের বেশি হবে না। আমাদের দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে সোজাসুজি বাক্যবাণ হানে সে অরুণের উদ্দেশেঃ 'তোমার ব্যাপার কি বল তো অরুণদা, নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, খালি খালি গল্পগুজব করে যাচ্ছ!'

'গল্পগুজব নয়, ইতিহাসচর্চা।' অরুণ বললে, 'নাওয়া-খাওয়া এঁদেরও হয়নি। এঁকে চেন তো!'

'চিনি বইকি।' মেয়েটি জবাব দিল, 'ইনি আমাকে না চিনলেও আমি এঁকে চিনি।' বলে সে এগিয়ে এসে জ্যাঠামশাইকে প্রণাম করল।

অরুণ বললে, 'রাজু ও কালুভাই একে দারোগার দারোগা বললে, এ কিন্তু তারও বাড়া—একশো জন দারোগা একত্র করলে যা হয়, এ হলো তাই—এর বাবা, মানে আমাদের দারোগাবাবু শ্যামাপদ গোস্বামী একে যমের মতো ভয় করেন। বলা বাহুল্য, ভয় আমরা আর সকলেও, মানে রাজুভাই, কালুভাই ও আমি, সর্বদাই করে থাকি একে। ঐ যাঃ, এর নাম তো বলা হলো না। দারোগাবাবু এর নাম দিয়েছিলেন নৃমুণ্ডমালিনী, নামটা ওজনে ভারি বলে ও নিজে তাকে ছেঁটে 'নীলা' করে নিয়েছে।'

'আঃ, কি যে যা তা সব বকে যাচ্ছ তার ঠিক নেই!' নীলা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেঃ 'এখন এঁদের নিয়ে বাড়ি চল।'

তারপর জ্যাঠামশাইয়ের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বললে, 'জপসার নীলাম্বর পালমশাই বিরাট একজোড়া ইলিশ মাছ পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনারা এসেছেন, মাছগুলোর চমৎকার সদ্ব্যবহার হয়ে যাবে। চলুন, আপনার মাঝিকেও আসতে বলুন...'

চরের মধ্যে রীতিমতো কোঠাবাড়ি বানিয়ে তুলেছেন শ্যামাপদ গোস্বামী। চারপাশে সুন্দর বাগান, রকমারি ফুল-ফলের সমাবেশ দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। বাগানের একপাশে একটি বাঁধানো বেদীর ওপরে পুজোয় বসেছেন শ্যামাপদ।

আমাদের বৈঠকখানা ঘরে বসিয়ে রেখে নীলা গেল রান্নাঘরে। নীলাকে সাহায্য করতে এগিয়ে যায় অরুণ।

খানিকক্ষণ বাদে এলেন শ্যামাপদ, তাঁর কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা এবং টিকিতে জবাফুল বাঁধা। জ্যাঠামশাইকে নমস্কার করে তিনি বললেন, 'আমার অশেষ সৌভাগ্য যে আপনার মতো পণ্ডিত মান্যজনের পায়ের ধুলো পড়ল আমার দরিদ্রের কুটিরে।'

জ্যাঠামশাই হেসে ফেলে বললেন, 'দরিদ্রের কুটির কি হে শ্যামাপদ, এ তো রীতিমতো রাজপ্রাসাদ। আমাদের ছয় হাবেলি ধ্বংস হয়ে কীর্তিনাশার কুক্ষিগত হলো, আর তোমার হাবেলি গড়ে উঠল!'

'সব মায়ের আশীর্বাদ যতীনবাবু। চরের বালির নিচে কোথায় তিনি চাপা পড়ে আছেন জানি না, তবে আছেন, সদা-সর্বদা জাগ্রত আছেন...'

'অষ্টভুজা দেবীর কথা বলছ তো? কোথায় চাপা পড়ে আছেন বলতে পার?'

'আমি কি করে বলব বলুন, বাবা বেঁচে থাকলে হয়তো পারতেন বলতে। তাঁর চোখের সামনেই তো অষ্টভুজার মন্দিরটা বন্যার জলে ডুবল। আচ্ছা যতীনবাবু, আপনিও তো দেখেছেন মন্দিরটাকে জলের তলায় তলিয়ে যেতে...'

'হ্যাঁ, দেখেছিলাম। কিন্তু তখন আমার বয়স খুবই কম। তা ছাড়া ভাঙনপর্বের পুরোটা দেখিনি, বন্যার শুরুতেই চলে গিয়েছিলাম এখান থেকে। তারপর কয়েক মাস বাদে ফিরে এসে দেখি যে, ধু ধু করছে বালির চর, ছয় হাবেলি বা মন্দিরের কোনো চিহ্ন কোথাও নেই। বন্যার জল নেমে যাওয়ার পর যে বিস্তীর্ণ বালির চর জেগে উঠল, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার বাবাও বুঝতে পারছিলেন না, কোথায় ছিল ছয় হাবেলি, অষ্টভুজার মন্দির! তবে যাকে বলে সন্ধান নেওয়া, সে আর হয়ে ওঠেনি, কারণ তার কোনো প্রয়োজন ছিল না।'

'প্রয়োজন ছিল না কেন?' প্রশ্ন করেন শ্যামাপদ।

'প্রয়োজন ছিল না, কারণ ছয় হাবেলিকে পুনরুদ্ধারের কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। ছয় হাবেলির প্রত্যেকটি বাড়িই যে ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল তা সকলেই দেখেছিলেন। তা ছাড়া নদীর ধারে যে ডাঙার ওপরে ছয় হাবেলি ছিল, বন্যার পর তা নদীর চরে পরিণত হয়েছিল—এই চরের জমি সম্পর্কে ছয় বাড়ির কোন বাড়িরই মালিকের কোনো আগ্রহ ছিল না। সকলের ধারণা ছিল যে ছয় হাবেলির সঙ্গে মন্দিরও ভেঙে গিয়েছে, অতএব মন্দিরটিকে পুনরুদ্ধার করার কথাও কেউ ভাবেননি।'

শ্যামাপদ গম্ভীর মুখে বললেন, 'আপনাদের তা হলে ধারণা যে অষ্টভুজার মন্দির ভেঙে ধূলিসাৎ হয়েছে?'

'ছয় বাড়ির ছয় কর্তার এই ধারণা।' জ্যাঠামশাই জবাব দিলেন, 'আমি নিজে অবশ্য বিশ্বাস করি যে মন্দির এবং অষ্টভুজা দেবীর মূর্তি এই বালুচরের নিচে চাপা আছে।'

'ঠিক বলেছেন। আমরা বংশানুক্রমে অষ্টভুজার পৌরোহিত্যে নিযুক্ত আছি, মন্দির এবং দেবীমূর্তি অবিনশ্বর বলেই বিশ্বাস করি। দেবী যখন নিত্য জাগ্রতা, তখন মন্দির ও দেবীমূর্তি অবশ্যই প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে কোথাও।'

'আচ্ছা শ্যামাপদ, দেবীর পুরোহিত হয়েও প্রচ্ছন্ন দেবীকে উদ্ধারের কথা কখনো চিন্তা করনি তুমি?'

'দেবী তো প্রচ্ছন্ন নন, প্রচ্ছন্ন দেবীমূর্তি। দেবীমূর্তি পুনরুদ্ধারের জন্য আমার বাবা মাথা ঘামাননি। তিনি ঐ বেদী নির্মাণ করে সেখানে বসে পূজার কাজ সমাধা করেছেন, আমিও করে যাচ্ছি, দেবীমূর্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা তিনি যখন করেননি, আমিও করিনি।'

'তুমি বলছিলে যে তোমার বাবার চোখের সামনে মন্দিরটা জলে তলিয়েছিল। অতএব তিনি হয়তো জানতেন এই চরের মধ্যে কোথায় চাপা আছে মন্দির ও দেবীমূর্তি। কিন্তু জানা সত্ত্বেও কেন তিনি তাদের পুনরুদ্ধারের কোনো চেষ্টা করেননি বলতে পার?'

'না, এ নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করিনি। কারণ যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন, পুজো-আর্চা নিয়ে আমাকে মাথা ঘামাতে হয়নি। গত বছর তিনি দেহ রেখেছেন, তারপর থেকে পূজোর দায়িত্ব আমার ওপরে পড়েছে, আমি তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে এখান থেকে কাজ সারছি।'

'অর্থাৎ অষ্টভুজা দেবীর পূজারী হলেও তাঁকে তুমি উদ্ধার করতে চাও না?'

'আমি একজন সামান্য মানুষ, এমনি একটি বড় ব্যাপার কি আমার দ্বারা সম্ভব?'

'তোমার দ্বারা কি সম্ভব সে যথাসময়ে দেখা যাবে। আমার অনুরোধ, আমাদের সন্ধানে তুমি সহযোগিতা করো।'

'আপনি বুঝি সন্ধান করবেন?'

'হ্যাঁ। চেষ্টা করব, অষ্টভুজার মূর্তি ও মন্দিরকে পুনরুদ্ধার করতে।'

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে জ্যাঠামশাই একটু বিশ্রাম করলেন। তারপর অরুণকে বললেন, 'চল, চরের মধ্যে, একটু ঘোরাঘুরি করে দেখি। শ্যামাপদ, তুমি যাবে তো?'

'আমাকে মাপ করুন যতীনবাবু।' শ্যামাপদ কাতরস্বরে বললেন, 'এই চরের মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে বড় ভয় করে আমার।'

'ভয় করে কেন?'

'বালির মধ্যে এক জায়গায় চোরা বালি আছে, ঘোরাঘুরি করতে করতে ওখানে পা পড়লেই সর্বনাশ...'

বলতে বলতে শ্যামাপদ শিউরে উঠতে থাকেন।

'চোরাবালিটা কোথায় আছে বলতে পার?' জ্যাঠামশাই প্রশ্ন করেন।

'না। বলতে পারলে ভাবনা ছিল না।'

অরুণ বললে, 'যতীনবাবুর সঙ্গে আমি কিন্তু যাব দারোগাবাবু। আমি গেলে আমার সঙ্গে আপনার সেপাই দুজনও যাবে...'

এ তো রীতিমতো রাজপ্রাসাদ।

'আমিও যাব।' নীলা বললে, 'চোরাবালি কখনো দেখিনি...'

‘তোমরা যদি যাও, আমাকেও যেতে হয়।’ শ্যামাপদ মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন।

একটানা বালুর চর প্রায় মরুভূমির মতো বিস্তীর্ণ। যতদূর দৃষ্টি চলে ঢেউ-খেলানো বালি। ফাঁকে ফাঁকে অবশ্য আখ ও সবজির ক্ষেত আছে। খানিকটা ঘোরাঘুরি করার পর জ্যাঠামশাই বললেন, ‘এই বালি ও পলিমাটির সমুদ্রের মধ্যে কোথায় চাপা পড়ে আছে ঐ মন্দির কি করে বুঝব? একটানা চরের বিস্তারের মধ্যে কোনো ব্যতিক্রম তো দেখা যাচ্ছে না! চারদিকে বালি আর বালি, দিক্‌চিহ্নহীন বালির বিস্তার, একেবারে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছি, কোন দিকে আমাদের নগর গ্রাম, কোনদিকে ডোমসার, কুঁয়োরপুর, কিছুই বুঝতে পারছি না।’
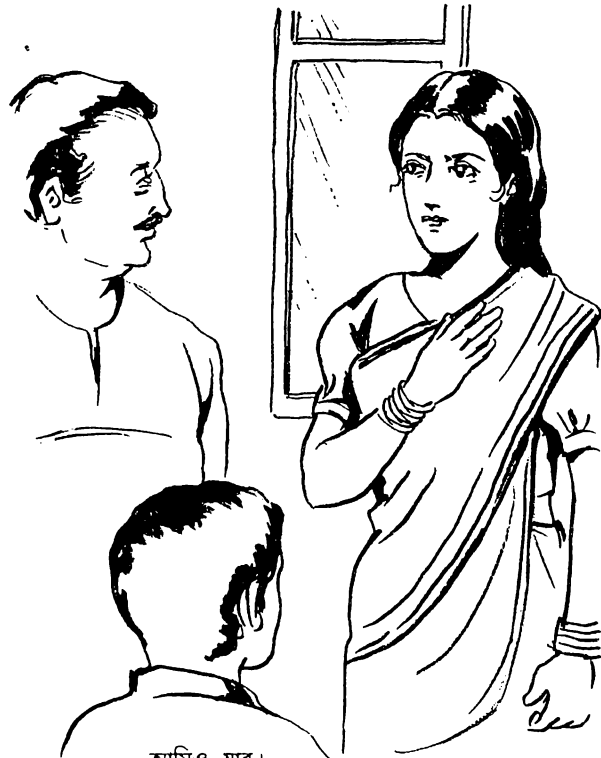
আমিও যাব।

আমাদের সঙ্গে সৈয়দ আলী ছিল, জ্যাঠামশাইয়ের কথা শুনে সে বললে, ‘ডোমসার কোনদিকে, বুঝতে পারেন না কর্তা? আপনি যেদিকে চাইয়া (তাকিয়ে) আছেন হেইদিকে (সেদিকে) তো ডোমসার!’

‘তাই নাকি! সামনের দিকেও তো বালির চর ছাড়া আর কিছু নেই!’

‘আর কিছু নাই কে কইল!’

‘আমি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি...’

‘বাল (ভাল) কইর‍্যা তাকাইয়া দ্যাহেন্ (দেখুন) কর্তা, সামনের ধু ধু-র পরে যে ধু ধু, তার বাঁকে ডোমসার...’

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি যে সত্যিই একটানা বহুদূর পর্যন্ত ধু ধু করছে বালি ও পলিমাটির চর—জলের ধারা তার মধ্যে প্রায় হারিয়ে গেছে।

জ্যাঠামশাই বললেন, ‘চল ডোমসারের দিকে হাঁটতে থাকি। আমার মনে আছে, ছয় হাবেলির বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডোমসারের দিকে কিছুটা যাওয়ার পর অষ্টভুজার মন্দিরে গিয়ে পৌঁছতাম।’

আমি বললাম, ‘বেলা পড়ে আসছে, আজ আর বেশিদূর গিয়ে কাজ নেই জ্যাঠামশাই।’

অরুণ বললে, ‘আজ আপনারা এখানে থেকে যান। রাত্রে অন্ধকার হলে পর আবার বেরুনো যাবে।’

‘অন্ধকার হলে পর বেরোবে মানে।’ শ্যামাপদ আঁতকে উঠলেনঃ ‘তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে!’

‘দিনের আলোয় ঘোরাঘুরি করে একঘেয়ে বালির চর ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবেন না। কাজেই রাতের আঁধারে বেরোবার কথা বলছি। এমন কিছু হয়তো থাকতে পারে, যা দিনের আলোয় দেখা যায় না, কিন্তু রাতের আঁধারে ফুটে ওঠে!’

‘না, তেমন কিছুই এখানে নেই।’ শ্যামাপদ গম্ভীর মুখে বললেন, ‘এখানে রাতের বেলাতেও আমি কম ঘোরাঘুরি করিনি। রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে শুধু চোরাবালির ফাঁদে পড়ার ভয় বাড়ে।’

‘চোরাবালিটা কোথায় বলতে পার?’ জ্যাঠামশাই প্রশ্ন করলেন।

‘না।’ শ্যামাপদ জবাব দিলেন, ‘চোরাবালির ফাঁদে না পড়লে তো তাকে চেনা যায় না, চোখে দেখে চোরাবালি সনাক্ত করা সম্ভব নয়।’

।। চার ।।

শ্যামাপদর বাড়িতে ফিরে এসে জ্যাঠামশাই বললেন, 'অরুণ, তুমিই দেখ ভাল করে। একটানা বালুচরের মধ্যে কোথাও কোনো ব্যতিক্রম আছে কি না খুঁজে বের করার চেষ্টা কর।'

অরুণ বললে, 'নিশ্চয়ই করব। আমার আন্তরিক আশা আছে যে মন্দির এবং অষ্টভুজার মূর্তিটিকে উদ্ধার করতে পারব। মাঝে মাঝে এসে আপনি আমাকে উৎসাহ দিয়ে যাবেন, আমার কাজে তা প্রেরণা যোগাবে।'

'আমি না আসতে পারলেও আমার ভাইপো আসবে।'

আমি বললাম, 'আমি এখানে থেকে অরুণদাকে সাহায্য করতে পারি।'

'তা হলে তো খুবই ভাল হয়।' অরুণ উৎসাহে বললে, 'দারোগাবাবু নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না.....'

'না না, আমি আপত্তি করব কেন!' শ্যামাপদ বললেন, 'যতীনবাবুর ভাইপো আমার কুঁড়েঘরে এসে থাকবে, এ তো আমার সৌভাগ্য!'

সৈয়দ আলী বললে, 'এ্যালা (এখন) বারিৎ (বাড়ি) চলেন কর্তা, মা-ঠারাইন আমারে কইয়া দিসিল আপনেরে সাঁঝের আগেই বারিৎ ফিরাইয়া লইয়া যাইতে।'

'ঠিক আছে, চল।' জ্যাঠামশাই বললেন, 'আমরা এখন তা হলে চলি অরুণ। আমাদের যাবার আগে তোমার যদি কিছু জানবার থাকে তো জেনে নাও।'

অরুণ বললে, 'আপনার স্মৃতি রোমন্থন করে আপনি অষ্টভুজার মন্দিরের একটি বর্ণনা দিন।'

'ছোটখাট পাথরের মন্দির, ছয় হাবেলি থেকে পুব দিকে, প্রায় আধ মাইল দূরে ছিল। তার সামনে বড়ো পদ্মপুকুর, বাঁধানো স্নানের ঘাট। পুকুরে একটা অতিকায় আকারের কাছিম ছিল, পুকুরের ধারে একজোড়া বড়ো গোসাপকে ঘুরে বেড়াতে দেখতাম। গোসাপ দুটো ছিল বলে সাপের উপদ্রব ছিল না ঐ মন্দিরে....মন্দিরের সঙ্গে পুকুরটি নিশ্চিহ্ন হয়েছে.....'

শ্যামাপদ বললেন, 'এই প্রসঙ্গে আমার একটা প্রশ্ন আছে যতীনবাবু! মন্দিরের পূজারী হিসেবে আমি মন্দির বা অষ্টভুজার মূর্তির পুনরুদ্ধারের কোনো চেষ্টা করিনি, কারণ আমার ধারণা, মায়ের ইচ্ছা নয় যে তিনি প্রকট হন। তিনি প্রচ্ছন্ন থাকলেও তাঁর পূজার যে কোনো ত্রুটি হচ্ছে না, তা তো আপনি জানেনই। এখন আমার প্রশ্ন, আপনি মাকে তাঁর গুপ্ত স্থান থেকে বের করে আনতে চান কেন?'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে দেবীমূর্তি ও মন্দির মাটিতে চাপা পড়েছে, দুর্যোগ কেটে যাবার পর আমাদের কর্তব্য তাদের উদ্ধার করা। এতকাল

এ কর্তব্য পালন না করাটা আমাদের দিক থেকে গুরুতর ত্রুটি, আমি সেই ত্রুটি সংশোধন করতে চাই।'

'আপনি তো জানেন যতীনবাবু, মাটিতে চাপা পড়া অষ্টভুজা দেবীকে হিন্দু-মুসুলমান নির্বিশেষে সকলেই জাগ্রত বলে জানে। তারা বিশ্বাস করে যে দেবী পাতালে অবস্থান করে সকলের মঙ্গলবিধান করছেন। দেবীমূর্তি চোখের সামনে নেই বলে কারুর কোনো ক্ষোভ নেই। এখন আপনার সন্ধানের ফলে যদি প্রমাণ হয় যে মন্দির এবং অষ্টভুজার মূর্তি কীর্তিনাশার কুক্ষিগত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছে তা হলে সাংঘাতিক একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে স্থানীয় লোকেদের মনের মধ্যে। অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়ার আগে এ কথা মনে রাখা দরকার।'

শ্যামাপদের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে জ্যাঠামশাই বললেন, 'অষ্টভুজার অষ্ট ধাতুর মূর্তিটি মাটিতে চাপা থাকলেও নিশ্চিহ্ন হওয়া উচিত নয়! আমার তো ধারণা যে মূর্তিটি মন্দিরসুদ্ধ কোথাও মাটিতে প্রোথিত অবস্থায় রয়েছে....'

'আমারও তাই ধারণা', শ্যামাপদ আমতা আমতা করে বললেন, 'কিন্তু বলা তো যায় না....হয়তো....'

'তুমি কি মূর্তিটি চুরি যাওয়ার আশঙ্কা করছ শ্যামাপদ?'

'না না, তা ঠিক নয়.....'

'আচ্ছা আমরা তা হলে চলি। অরুণ, তুমি তোমার সন্ধান চালিয়ে যেয়ো.....'

উত্তরের ঘরের সামনের বারান্দায় বসে জ্যাঠামশাই তামাক খাচ্ছিলেন তাঁর সেই রুপোর আলবোলা থেকে।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে ধূমপান করে জ্যাঠামশাই বললেন, 'দেবী অষ্টভুজাকে সবাই জাগ্রত বলে মানে। হিন্দু, মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই। কীর্তিনাশার কুক্ষিগত হলেও তারা মনে করে যে দেবী পাতালে অবস্থান করে সকলের মঙ্গল বিধান করছেন। এই যে প্রতিবছর এখানকার জমিজমাতে ভাল ফসল ফলে, এর থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে দেবী মাটির সঙ্গে মিশে আছেন।'

'হিন্দুদের মতো মুসলমানরাও বিশ্বাস করে এ কথা!'—আমি অবাক হয়ে বললাম।

'করে বইকি! পূর্ববঙ্গের নানা জায়গায় এমন অনেক দেবস্থান আছে, যেখানে হিন্দুদের মতো মুসলমানরাও পূজা দেয়। আবার এমন অনেক দরগা এবং পীর-ফকিরদের সমাধিস্থান আছে, যেসব জায়গার মুসলমানদের মতো হিন্দুরাও গিয়ে মানত করে, সিন্নী দেয়....'

'আশ্চর্য ব্যাপার তো!'

'আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পূর্ববঙ্গের মাটির এমনই গুণ যে তা হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টান নির্বিশেষে সকলকেই এক করেছে।'

এমন সময় আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল একজন মুসলমান যুবতী। আমাদের যৎসামান্য জমিজমা চায করত সামাদ আলী, তার স্ত্রী। তার হাতে একটা ছোট কলসী, কলসীর মুখ কলাপাতা দিয়ে বাঁধা।

'কি ব্যাপার?' মুখ থেকে হুঁকোর নল নামিয়ে প্রশ্ন করলেন জ্যাঠামশাই।

'আপ্নের লাইগ্যা একটু খেজুরের গুড় আনছিলাম কর্তা।' মুখ নিচু করে বললে সামাদ আলীর স্ত্রী, 'অসুখের থন সাইর‍্যা উইঠ্যা ও বানাইছে।'

'সামাদ আলীর অসুখ সেরে গিয়েছে?'

'হ বড়কর্তা, এক্কেবারে সাইর‍্যা গেছে। ওযুধ-বিযুধে তো কোনো কাম অইল না—ঠারাইনের (ঠাকরুন) থান থেইক্যা মাটি আইন্যা তার গায়ে মাখাইতেই অর জ্বর ছারল....ঠারাইনের দয়াতেই অরে ফিরা পাইছি....'

বলতে বলতে অবরুদ্ধ হয়ে আসে সামাদ আলীর স্ত্রীর গলার স্বর।

'ঠারাইনের থান মানে কোন দেবীর স্থান? আমাদের কাত্যায়নীর ঘরের সামনের মাটি না তো!' জ্যাঠামশাই প্রশ্ন করেন।

'আইগ্যা না কর্তা।' সামাদ আলীর বৌ উত্তেজিত স্বরে বললে, 'ঠারাইন মানে জপসার চরের ঠারাইন। ঐ চরই ঠারাইনের থান। হেইদিন (সেদিন) সৈয়দ আলী ভাই হেইখানেই নিয়া গ্যালো আপনাগো!'

'জপসার ছয় হাবেলির চরকে তুমি ঠারাইনের থান বলছ!'

'হ কর্তা। ঠারাইন মাটিতে মিশ্যা (মিশে) আছেন, তাই পুরা চরটাই ঠারাইনের থান অইয়া গেছে।'

'চর থেকে কোথাকার মাটি তুলে এনে তুমি সামাদ আলীর গায়ে মাখিয়েছিলে?'

'আমি তুইল্যা আনি নাই কর্তা, তুইল্যা দিচ্ছেন দারোগাঠাকুর ত্যানার পূজার বেদীর সামনের থেইক্যা।'

গুড়ের কলসী বারান্দায় নামিয়ে রেখে সামাদ আলীর স্ত্রী জ্যাঠামশাইয়ের হাতে একটি চিরকুট দিয়ে বললে, 'এই কাগজখান দারোগাঠাকুরের ঘরে যে বোমাবাবু আসে (আছে), হে (সে) দিসে (দিয়েছে) আমারে....লুকাইয়া লুকাইয়া দিসে দারোগাঠাকুর ত্যানার ঘরে ঢুইক্যা যাওনের পর—কইসে, তোমার বড়কর্তারে দিয়া দিয়ো।'

বলে চলে গেল সামাদ আলীর স্ত্রী। চিরকুটটা খুলে জ্যাঠামশাই পড়লেন। তারপর আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এই দ্যাখ, অরুণ কি লিখেছে।'

জ্যাঠামশাইকে লেখা অরুণের চিঠিটা পড়লাম। অরুণ লিখেছে, 'দারোগাবাবু আমাকে চরের মধ্যে ইচ্ছেমতো ঘোরাঘুরি করতে দিচ্ছেন না। পশ্চিমে জপসার বন্দর পর্যন্ত যেতে দিলেও পুবদিকে আখের খেত পেরিয়ে এক পা-ও এগিয়ে যেতে দিচ্ছেন না আমাকে, বলছেন আখের খেতের ও পাশটা নাকি বিপজ্জনক, কারণ ওদিকে চোরাবালি থাকতে পারে। আমি ওঁকে যতই বোঝাই না কেন যে আমি যথেষ্ট সতর্ক হয়ে চলাফেরা করব, তিনি আমার কথা কানেও তুলছেন না। অতএব, চরের মধ্যে যে সন্ধান নেবার প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম, তা আমি রাখতে পারছি না।'

অরুণের চিঠি পড়া শেষ করে আমি বললাম, 'অরুণদা তাহলে আমাদের কোনো কাজে আসবেন বলে মনে হচ্ছে না।'

'নিশ্চয় আসবে। আমি ভাবছি, দু'একদিন শ্যামাপদর ওখানে গিয়ে থাকব....আমার উপস্থিতিতে শ্যামাপদ নিশ্চয়ই অরুণকে বাধা দিতে পারবে না....'

‘আমিও যাব আপনার সঙ্গে।’ আমি বললাম, ‘অরুণদার সঙ্গে আমিও ঘোরাঘুরি করব।’

বুড়াশিবের ঘাটে একটা ময়ূরপঙ্খী নাও আইসা লাগসে।

জ্যাঠামশাই বললেন, ‘আগে ও ঘোরাঘুরি করতে শুরু করুক, তারপর ওর সঙ্গে তোর বেরোনোর প্রশ্ন। শ্যামাপদ যদি অরুণকে আদৌ চরের পুবদিকে যেতে না দেয়, তুই ও আমি দু’জনে মিলে ঘোরাঘুরি করব।’

আমি বললাম, 'আচ্ছা জ্যাঠামশাই, সামাদ আলীভাইয়ের বৌ যে বললে শ্যামাপদ গোস্বামীমশাইয়ের বেদীর সামনের মাটি তুলে এনে সামাদ আলীভাইয়ের গায়ে মাখাতেই তার জ্বর ছাড়ল, ব্যাপারটা কি অবিশ্বাস্য নয়?'

'অবিশ্বাস্য হবে কেন! সামাদ আলীর বৌ নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলেনি।'

'তার মানে শ্যামাপদবাবুর পূজার বেদীটাই দেবতার থান?'

'না, জপসার কাছে গোটা নদীর চরটাই হচ্ছে দেবতার স্থান। দেবতা মানে অষ্টভুজা দেবী। চরের বালির নিচে কোথায় তাঁর মূর্তি চাপা পড়ে আছে, তা তো কেউ জানে না, কাজেই সমস্ত চরটাকেই তাঁর স্থান বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। শ্যামাপদ যেখানে বসে পুজো দিচ্ছে, তার ওপরে বিশেষ পক্ষপাত অবশ্য দেখা যাচ্ছে। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কারণ নিয়মিত যেখানে পুজো-আর্চা হয়, দেবতা সেখানেই বিরাজ করেন বলে সামাদ আলীর বৌয়ের মতো সরল মানুষদের মনে বিশ্বাস হতে পারে।'

আমি অবাক হয়ে জ্যাঠামশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, 'কিন্তু জ্যাঠামশাই, এটা কি করে সম্ভব? ওষুধ-বিষুধে ফল হলো না, জ্বর ছাড়ল কিনা চরের মাটি গায়ে মেখে!'

'বিশ্বাসের জোরেই সম্ভব হয়েছে।' জ্যাঠামশাই জবাব দিলেন, 'বিশ্বাসের জোরে মানুষ অবিশ্বাস্য ব্যাপারকে সম্ভব করে তুলতে পারে, জ্বর ছেড়ে যাওয়া তো সামান্য ব্যাপার। এ জাতীয় অন্ধ বিশ্বাস মনের ওপরে বেশ জোরালো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। তার ফলস্বরূপ রোগ-নিরাময় পর্যন্ত সম্ভব!'

'সামাদ আলীভাই ও তার বউয়ের ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হচ্ছে যেন তারা অষ্টভুজা দেবীর প্রভাবে মনে-প্রাণে হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে।'

'না না, তা কেন, মনে-প্রাণে তারা মুসলমানই আছে। তবে অষ্টভুজাকে তারা হিন্দুদের মতোই জাগ্রত দেবী বলে মনে করে। একটু আগেই তোমাকে পুব বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ ধর্মীয় বিশ্বাসের কথা বলছিলাম।'

এমন সময় দৌড়তে দৌড়তে এল সৈয়দ আলী, উত্তেজনায় তার চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললে, 'বুড়াশিবের ঘাটে একটা ময়ূরপঙ্খী নাও আইসা লাগসে, আহেন, দ্যাহেন আইস্যা....'

'ময়ূরপঙ্খী নৌকা!' জ্যাঠামশাই অবাক হয়ে বললেন, 'বল কি!'

তারপর তিনি তাঁর লাঠিটা তুলে নিয়ে সৈয়দ আলীকে অনুসরণ করে বুড়াশিব, মানে বড়ো শিবলিঙ্গের কাছে জলার ধারে যে বাঁধানো ঘাট আছে, সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। তাঁর সঙ্গে আমিও গেলাম। ঘাটে সত্যিই একটি সুদৃশ্য হাউস-বোট বাঁধা আছে। সাদা রঙ-করা, জলে ভাসমান বাড়ি যেন।

দু'জন মাঝি ঘাটে নেমে বোটটাকে বাঁধছিল, জ্যাঠামশাই তাদের প্রশ্ন করেন, 'কার নৌকা এটা, এখানে বাঁধলে কেন?'

'ছাহেবের নৌকা কর্তা!' মাঝিদের মধ্যে একজন জবাব দিল, 'ছাহেব আইজ এহানে রাত কাটাইব।'

'কোথা থেকে আসছ তোমরা?'

'আইজ্ঞা মাদারীপুর।'

'তোমাদের সাহেব এখানে কি করতে এসেছেন?'

'তা তো জানি না কর্তা। ঐ যে ছাহেব আহে, ত্যানারে জিগায়েন।'

বোটের মধ্য থেকে বেড়িয়ে এল একজন ইংরেজ যুবক। নৌকা থেকে নেমে জ্যাঠামশাইয়ের কাছে এগিয়ে আসতে আসতে বললে, 'আপনিই বোধহয় যতীন্দ্রমোহন রায়?'

'হ্যাঁ।' জ্যাঠামশাই জবাব দিলেন, 'তুমি কি টমাস রাইট?'

'হ্যাঁ। আপনার কাছ থেকে কোনো খবর না পেয়ে আমি নিজেই চলে এসেছি। এখন বলুন, মন্দির ও মূর্তির হদিস পেয়েছেন কি?'

'হদিস পেয়েছি, কিন্তু খুঁজে পাইনি।'

'তার মানে?'

'চল, আমাদের বাড়িতে চল, তোমাকে সব কথা খুলে বলছি।'

টমাসকে নিয়ে উত্তর ঘরের সামনের বারান্দায় বসলেন জ্যাঠামশাই। ইতিমধ্যে টমাসকে ঘিরে বড়ো রকম ভিড় জমে যায়। যারা ভিড় করে, তারা সাদা চামড়ার সাহেব আগে কখনো দেখেনি। তারা এমনি নিবিষ্ট হয়ে তাকে দেখতে থাকে, যেন চিড়িয়াখানার একটি আজব জীবকে তাদের মধ্যে পেয়েছে তারা।

জ্যেঠিমা ও দিদিদের ডেকে এনে জ্যাঠামশাই বললেন, 'টমাস আমাদের এখানে খাবে। ব্যবস্থা কর।'

'ব্যস্ত হবেন না।' টমাস ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললে, 'আপনারা যা খাবেন, তাই খাব, আমার জন্য আলাদা করে কোনো ব্যবস্থা করতে হবে না।'

'আমরা যা খাই তাই খাইবা তুমি!' জ্যেঠিমা অবাক হয়ে তাকালেন টমাসের দিকে।

'হ্যাঁ। মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেতে আমার খুব ভাল লাগে।'

পিঁড়ি পেতে কাঁসার থালায় জ্যেঠিমা পরিবেশন করলেন সাপলা ভাজা, কচুর শাকের তরকারি, ইলিশ মাছ এবং চালতার টক। খেতে খেতে টমাস বললে, 'বাঃ, চমৎকার!'

খেতে খেতেই টমাস জ্যাঠামশাইয়ের কাছ থেকে অষ্টভুজার মন্দির ও মূর্তি সম্পর্কে সব কথা শুনে নিল। জ্যাঠামশাইয়ের কথা শেষ হতেই সে বললে, 'মনে হচ্ছে, দারোগাবাবু চান না যে মন্দির ও মূর্তি উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা চলে। তার কারণ বোধহয় এই যে অরুণবাবুকে তিনি ইচ্ছেমতো ঘোরাঘুরি করতে দিতে চান না। তা ছাড়া স্থানীয় লোকেরাও মনে হয় সেই মন্দির ও মূর্তিটাকে উদ্ধার করতে চায় না।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'স্থানীয় লোকেরা মন্দির বা মূর্তি সম্বন্ধে বিশেষ মাথা ঘামায় না। ষাট বছর ধরে যা তাদের চোখের সামনে নেই, তা নিয়ে তাদের কোনো চিন্তা থাকার কথা নয়। তবে চরটাকে তারা অষ্টভুজা দেবীর স্থান বলে বিশ্বাস করে।

শ্যামাপদ তার বাড়ির উঠোনে বেদী বানিয়ে পুজো করে, তাতেই তারা খুশি—ওখানে গিয়ে পুজো দিচ্ছে। অতএব মাটিচাপা মন্দির বা মূর্তি উদ্ধার করার কোনো আগ্রহ কারুর থাকার কথা নয়।'

'যা করার তাহলে আমাকেই করতে হবে।' টমাস বললে, 'মন্দির উদ্ধার করি বা না করি, অষ্টভুজা দেবীর মূর্তিটিকে খুঁজে বের করতেই হবে। চোখ দুটি মূর্তিটিকে ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। জানলেন মিস্টার রায়, আমি আজকাল চক্ষুহীন দেবীর স্বপ্ন দেখছি, চক্ষুহীন কোটর দুটি যেন একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে থাকে। রাতের পর রাত এই দেখে যাচ্ছি....'

বলতে বলতে টমাস শিউরে উঠতে থাকে।

।। পাঁচ ।।
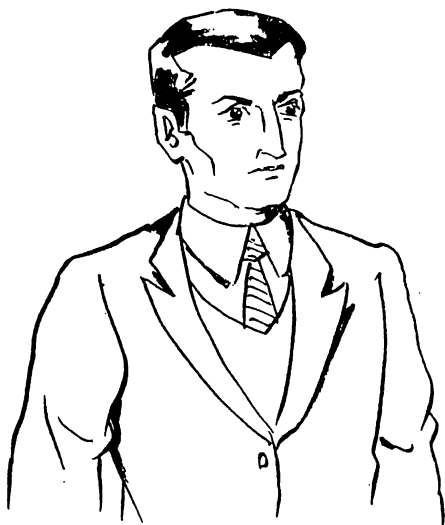
জ্যাঠামশাই বললেন, 'চক্ষুহীন দেবীর চোখ দুটি তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মনে মনে খুবই অস্থির হয়ে উঠেছ—মাঝে মাঝে হয়তো চক্ষুহীন দেবীর মূর্তি তোমার মনে ভেসে উঠেছে—তাই এই স্বপ্ন.....'

'রীতিমতো দুঃস্বপ্ন, মিস্টার রায়! এই স্বপ্নের খপ্পর থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই!' টমাস বললে।

'চোখ দুটি মূর্তিকে ফেরত দিলেই তোমার এই দুঃস্বপ্ন ঘুচে যাবে। ভয় নেই, মূর্তিটা মাটির নিচে আছে নিশ্চয়ই। মাটিতে চাপা পড়ে নষ্ট হতে পারে না, কারণ মূর্তিটি অষ্ট ধাতুর তৈরি। চরের মধ্যে খোঁজাখুঁজি কর, খুঁজে নিশ্চয়ই পাবে।'

'নিশ্চয়ই পাব। আমি আজই যাব সেখানে, খোঁজাখুঁজি করে যাব যতদিন না খুঁজে পাচ্ছি। জপসায় কোনো উপযুক্ত জায়গায় নৌকাটিকে বেঁধে রাখব। আমার নৌকাই আমার ঘরবাড়ি, কাজেই থাকার জায়গার দরকার হবে না।'

'তুমি নিজে যদি ওখানে থাক, শ্যামাপদ অরুণকে বাধা দিতে পারবে না, অরুণকে নিয়ে তুমি খোঁজখুঁজিতে লেগে যেতে পারবে।'

আমি বললাম, 'জ্যাঠামশাই, মিস্টার টমাসের সঙ্গে আমিও যাব, আমার মনে হয় খোঁজাখুঁজির কাজে ওঁদের আমি সাহায্য করতে পারব।'

আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে টমাস বললে, 'তুমি আমাদের সাহায্য করবে!'

মৃদু হেসে জ্যাঠামশাই বললেন, 'ছোট ছেলে হলেও ওর পর্যবেক্ষণশক্তি বেশ প্রখর।'

টমাস বললে, 'তোমার জ্যাঠামশাই যদি অনুমতি দেন, অবশ্যই যাবে তুমি আমাদের সঙ্গে। কিন্তু তোমার পড়াশুনার ক্ষতি হবে না?'

'না।' আমি জবাব দিলাম, 'বর্মা থেকে চলে এসেছি মার্চ মাসে, তখন জাপানী বোমার আতঙ্কে বেশির ভাগ স্কুলই বন্ধ। কাজেই কোনো স্কুলে ভর্তি হতে পারিনি। ঠিক হয়েছে আগামী জানুয়ারি মাসে আমাদের গ্রামের স্কুলে ভর্তি হবো।'

'তার মানে আর মাস দুয়েক তোমার পড়ার চাপ নেই। তা হলে আর কি, তোমার অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে চল আমার সঙ্গে।'

'জ্যাঠামশাই, যাব আমি মিস্টার রাইটের সঙ্গে?' জ্যাঠামশায়ের মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমি প্রশ্ন করি।

'হ্যাঁ, যেতে পার। টমাস নিজে একজন ঐতিহাসিক, তার সঙ্গে থেকে যদি ঐতিহাসিক সমীক্ষার শিক্ষা পাও, আমি খুশি হবো।'

ঠিক হলো, টমাসের বজরা করে টমাস ও আমি সেদিন বিকেলেই জপসা যাব।

বজরার ঘরগুলোতে যা ব্যবস্থা আছে, টমাসের সঙ্গে বজরাতেই থাকতে পারব বলে মনে হলো। টমাস তাড়াতাড়ি আমার জামাকাপড় গুছিয়ে নিয়ে বজরাতে চলে আসতে বললে।
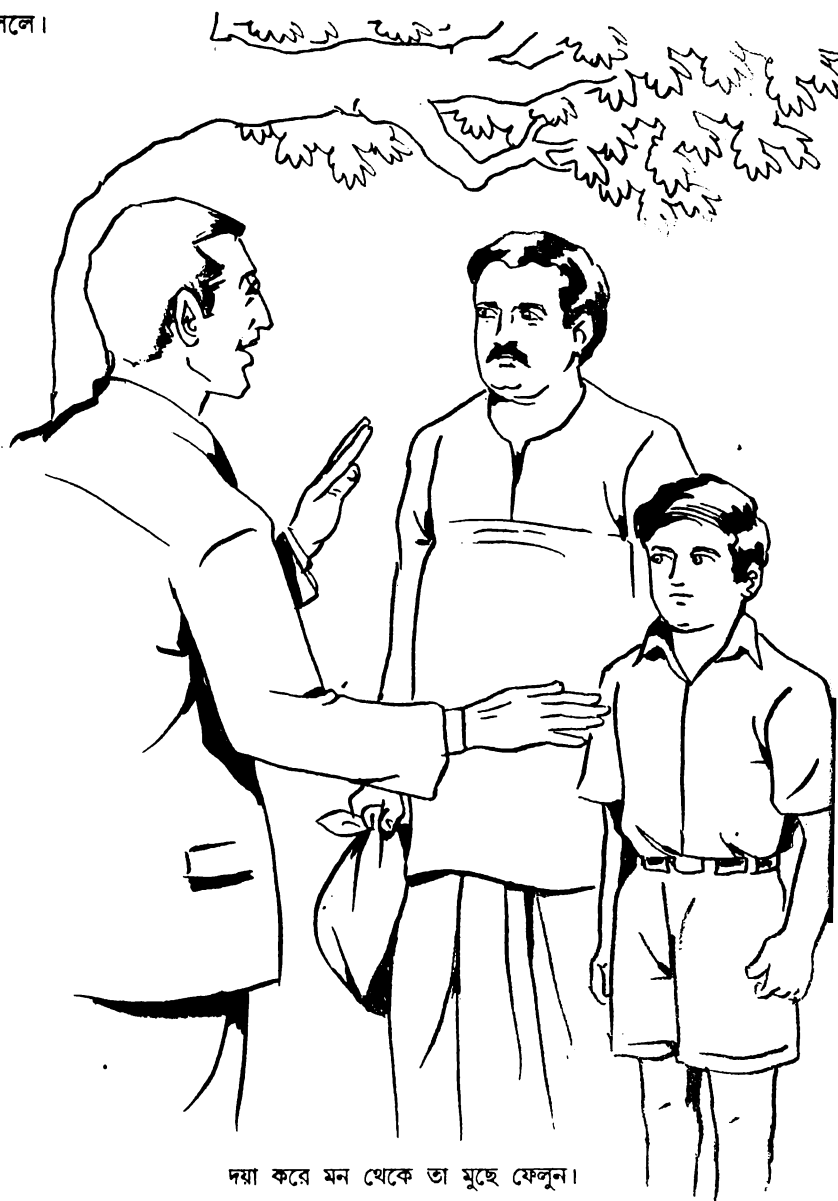
দয়া করে মন থেকে তা মুছে ফেলুন।

আমার জামাকাপড় একটা থলিতে গুছিয়ে নিয়ে টমাসের সঙ্গে বুড়োশিবের মন্দিরের ঘাটে বাঁধা বজরার দিকে এগিয়ে যাই। আমাদের এগিয়ে দিতে এলেন জ্যাঠামশাই।

টমাস জ্যাঠামশাইকে বললে, 'আপনি আর কষ্ট করছেন কেন! আপনার ভাইপো সম্বন্ধে আপনার মনে যদি কোনো দুশ্চিন্তার উদ্রেক হয়ে থাকে, দয়া করে মন থেকে তা মুছে ফেলুন। কাজ শেষ হলেই ওকে আপনার কাছে পৌঁছে দিয়ে যাব-একটুও ভাববেন না আপনি।'

'আমার ভাইপোর জন্য শুধু নয়, তোমার জন্যও ভাবছি।' মৃদু হেসে জ্যাঠামশাই বললেন, 'খুব সাবধানে থাকবে। বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন চরের ওপর দিয়ে চলাচলের সময়.....চোরাবালি থেকে সাবধান....'

আমি বললাম, 'আচ্ছা জ্যাঠামশাই, দারোগাঠাকুর, মানে শ্যামাপদবাবু তো চোরাবালির খবর রাখেন, মানে তিনি বোধহয় জানেন কোথায় রয়েছে চেরাবালি....'

'জানেন বলেই মনে হয়।' জ্যাঠামশাই বললেন, 'অরুণ এত ঘোরাঘুরি করেছে সেও হয়তো.....কিন্তু, মুশকিল হয়েছে এই যে অরুণকে তো ওদিকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না.....'

'নীলা দুটি আপনাকে দেখাতে চাই...

টমাস বললে, 'অরুণ যাতে চরের মধ্যে স্বাধীনভাবে ঘোরাঘুরি করতে পারে, সে ব্যবস্থা আমি করব।'

'তা হলে তো ভালই হয়। দেশের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছে, ইতিহাসচর্চাও সে সমান নিষ্ঠার সঙ্গে করবে। খুব ভাল ছেলে অরুণ...'

আমি বললাম, 'শ্যামাপদবাবুও তো ভাল লোক। ধর্মভীরু পুলিশ অফিসার...'

'নিশ্চয়ই, শ্যামাপদ সত্যিই ধর্মভীরু ভাল মানুষ। ওরা সবাই ভাল...কিন্তু...'

'কিন্তু কি জ্যাঠামশাই?'

'সাবধান...খুব সাবধান...'

জ্যাঠামশাইয়ের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে টমাস বললে, 'সবই ভাল, চরের মধ্যে চোরাবালি ছাড়া আর কোনো বিপদ নেই, তবু আপনি আমাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বেগ বোধ করছেন!'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'হ্যাঁ। কিন্তু কেন তা তোমাদের কাছে খোলসা করে বলতে পারব না। সদাসর্বদা সাবধান ও সতর্ক থেকো। বজরার মধ্যে থাকবে তোমরা, বজরার
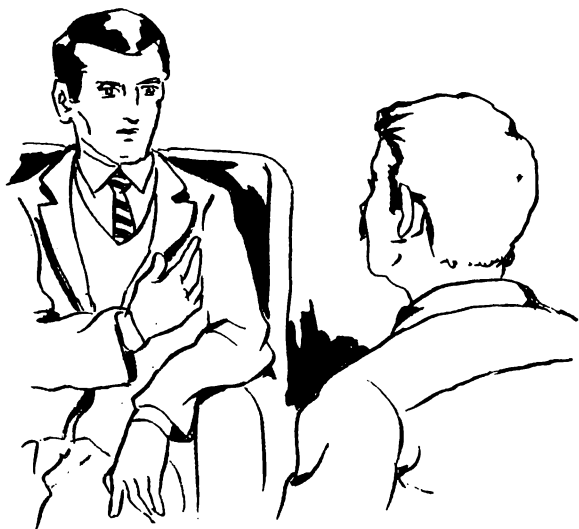
দরজা তো তেমন পোক্ত নয়, বিশ্বস্ত কোনো লোককে পাহারাওয়ালা হিসেবে মোতায়েন করতে পারলে ভাল হয়। চাও তো এখান থেকে একজনকে তোমাদের সঙ্গে পাঠাতে পারি।'

'কোনো দরকার নেই। আমার বজরার জানালাগুলো যথেষ্ট মজবুত। তাছাড়া আমার একজন পাহারাওয়ালা আছে, দিনরাত অবিশ্রান্ত পাহারা দিয়ে যাচ্ছে...'

'তাহলে তো ভালই।'

'চলুন না, নিজের চোখে দেখবেন আমার বজরার দরজা-জানালাগুলি কি রকম মজবুত। মাদারিপুরের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব্ পোলিস-এর নিজস্ব বজরা এটি, সেরা বর্মী সেগুন দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। দেখবেন আসুন...'

টমাসকে অনুসরণ করে বজরার মধ্যে ঢুকলাম আমরা। শোবার ও বসবার ঘর, রান্নাঘর প্রভৃতি নিয়ে ছোটখাট একটা বাড়ি। বসবার ঘরে জ্যাঠামশাইকে বসিয়ে টমাস দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে চাপা গলায় বললে, 'নীলা দুটি আপনাকে দেখাতে চাই...'

তারপর ঘরের কোণে রাখা দেরাজ থেকে একটি ভেলভেটে মোড়া ছোট বাক্স বের করল টমাস। বাক্সটি খুলতেই প্রকাশ পেল উজ্জ্বল নীল রঙের দীপ্তি। বেশ বড় আকারের এক জোড়া নীল পাথরের চোখ। দেখে চোখ ঝলসে যায়।

'নীলা।' টমাস চাপা উত্তেজিত স্বরে বললে, 'সংস্কৃত প্রাচীন রচনায় একে বর্ণনা করা হয়েছে 'নীলকান্ত মণি' বলে। দেখছেন তো কিরকম আশ্চর্য আলো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে!'

আমি বললাম, 'দেখে মনে হচ্ছে যেন এক জোড়া জীবন্ত চোখ!'

'ঠিক বলেছ।' টমাস বললে, 'দেহ নেই শুধু এক জোড়া চোখ! নির্জন ঘরে নেড়েচেড়ে দেখতে গিয়ে আঁৎকে উঠি। সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ফুটে ওঠে চক্ষুহীন দেবীমূর্তি।'

তারপর জ্যাঠামশাইকে সম্বোধন করে সে বললে, 'আচ্ছা মিস্টার রায়, শুধু চোখ দেখে কি বোঝা যায় কোন দেবতা বা দেবীর চোখ?'

'এমনিতে বোঝা যায় না, তবে যে বোঝে সে বোঝে। ঢাকা জেলার সব ক'টি মন্দির ও দেবালয়ে যাবতীয় দেবদেবীর মূর্তি পরীক্ষা করেছি আমি ঢাকার ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে। কাজেই চোখ দেখে মোটামুটি আন্দাজ করতে পারি কার চোখ।'

'চোখ দুটিকে অষ্টভুজা দেবীর বলে সনাক্ত করতে পারছেন তো?'

'আমাদের অষ্টভুজা দেবীর চোখের কোটরে এই চোখ দুটি বসানো ছিল বলে মনে হচ্ছে। শ্যামাপদর কাছে একটি পুঁথি আছে, তার নাম 'দেবীসূক্তম্', তাতে এমনি উজ্জ্বল নীল চোখের বর্ণনা আছে। কিন্তু এমন চোখ অষ্টভুজা দেবীর চোখে থাকার কথা নয়। বৌদ্ধতন্ত্রের মধ্যে যে সব দেবীর বর্ণনা পাওয়া যায়, তাঁদের চোখেই

এরকম নীলার চোখ শোভা পেত বলে জানা যায়। ঢাকা শহর থেকে মাইল কুড়ি উত্তর-পশ্চিমে কাঁকলাজানি নদীর ধারে ধামরাইতে বৌদ্ধদের ধর্মরাজিকা বা কীর্তিস্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ আছে। তার মধ্যে একটি দেবীমূর্তির চোখে এমনি নীলা আমি দেখেছিলাম। সম্ভবত ধামরাইয়ের কোনো দেবীমূর্তির চোখের নীলা এখানকার অষ্টভুজার চোখে লাগানো হয়েছিল।'

টমাস বললে, 'তার মানে এই নীলা দুটি ধামরাইয়ের বৌদ্ধ দেবীমূর্তির চোখ?'

'হ্যাঁ, মানে আমার তাই ধারণা। তবে সেই দেবীমূর্তি থেকে চোখ দুটি তুলে আনা হয়েছিল কয়েক শো বছর আগে এবং এখন সেই মূর্তিকে খুঁজে বের করা অসম্ভব ব্যাপার। অতএব তোমার ঠাকুর্দা যেখান থেকে নিয়েছিলেন, সেখানেই ফেরত দেওয়া বাঞ্ছনীয়।'

'তা অবশ্যই ঠিক। আমার ঠাকুর্দা অষ্টভুজার মূর্তি থেকে নিয়েছিলেন, অতএব সেই অষ্টভুজা মূর্তিতেই তাদের ফেরত দিলে আমার কর্তব্য শেষ হবে। আচ্ছা মিস্টার রায়, অষ্টভুজার মূর্তিটির বর্ণনা দিতে পারেন?'

'দিতে পারি। অষ্টধাতু দিয়ে তৈরি মূর্তি, আটটি ধাতুর মধ্যে সোনাও আছে।'

'বলেন কি!' টমাস চমকে উঠলঃ 'সোনার মূর্তি!'

'সোনার মূর্তি, নীলার চোখ, অমূল্য জিনিস! আকারে অবশ্য তেমন বড় কিছু নয়।'

জ্যাঠামশাই নৌকা থেকে নেমে গেলে পর মাঝিরা নোঙর তুলে নৌকা ভাসিয়ে দিল।

।। ছয় ।।

জলার পর খাল। খালের দু'পাশে পাটের ক্ষেত। জলে থৈ থৈ করছে বলে জলার মতোই দেখাচ্ছে। খালের মধ্যে জায়গায় জায়গায় চাঁই, অর্থাৎ মাছ ধরার খাঁচা বসানো আছে। তার মধ্যে ধরা পড়ছে রকমারি মাছ। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে যা নজর কেড়ে নিচ্ছে, তা হচ্ছে গলদা চিংড়ি। টমাস মুগ্ধ দৃষ্টিতে খাঁচায় বন্দী মাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'এত মাছ, এত জল, এমনটি দক্ষিণ বর্মা ও থাইল্যাণ্ড ছাড়া আর কোথাও দেখিনি।'

জলা ও খালের ধারা বেয়ে পৌঁছলাম কীর্তিনাশা নদীতে। নদীতে জলের চেয়ে বালি বেশি, নদীর ধারাকে আচ্ছন্ন করেছে বালির চড়া।

অদূরে বালুচরের মধ্যে শ্যামাপদর ঘর দেখতে পাই। এখানে বড় আকারের একটা বালিয়াড়ি আছে। টমাসের ইচ্ছেমত এই বালিয়াড়ির আড়ালে নৌকা বাঁধা হলো।

টমাস বললে, 'বালিয়াড়ির আড়ালে নৌকা বাঁধলাম কেন জান তো?'

'হ্যাঁ।' আমি জবাব দিলাম, 'এখানে নৌকা বাঁধলে শ্যামাপদবাবুর বাড়ি থেকে আমাদের দেখা যাবে না। কিন্তু জ্যাঠামশাই তো আমাদের অরুণদার সাহায্য নিতে বলেছিলেন।'

'তা তো নেবই। তাছাড়া শ্যামাপদবাবুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করব। কিন্তু আপাতত আমরা নিজেরা একটু স্বাধীনভাবে ঘোরাঘুরি করব। ওদের নজরে এলে ওরা আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে, কাজেই ওদের দৃষ্টির আড়ালে থাকতে চাই।'

'দৃষ্টির আড়ালে থাকতে হলে তো এই বালিয়াড়ির আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে! ঘোরাঘুরি করতে গেলে তো ওদের নজরে পড়ে যাব...'

'ঘোরাঘুরি করব অন্ধকার হলে পর। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ঘোরাঘুরি করলে ওরা আমাদের দেখতে পাবে না।'

আমি অবাক হয়ে টমাসের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, 'অন্ধকারে ঘোরাঘুরি করে লাভ! অন্ধকারের মধ্যে কি দেখতে পাব আমরা! অন্ধকারে আমরা হারিয়ে যেতেও পারি!'

'না। আমার জ্যাকি কুকুর আমাদের সঙ্গে থাকবে, সে আমাদের ঠিক এখানে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।'

নৌকা থেকে নেমে আমরা বালিয়াড়ি ঘেঁষে দাঁড়াই। বালিয়াড়ির বালির স্তূপ নদীর বালুচরেরই অঙ্গ। চরের ওপরে অতিরিক্ত বালি জমে তার সৃষ্টি। অনেকটা বালির পাহাড়ের মতো দেখাচ্ছে। তার আড়ালে দাঁড়িয়ে বালুচরের প্রান্তে সূর্যাস্ত দেখি। সূর্য

যেন লাল আগুনের গোলার মতো বালির মধ্যে ডুবে গেল। টমাস মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললে, 'ঠিক যেন মরুভূমির মধ্যে সূর্য অস্ত গেল...'
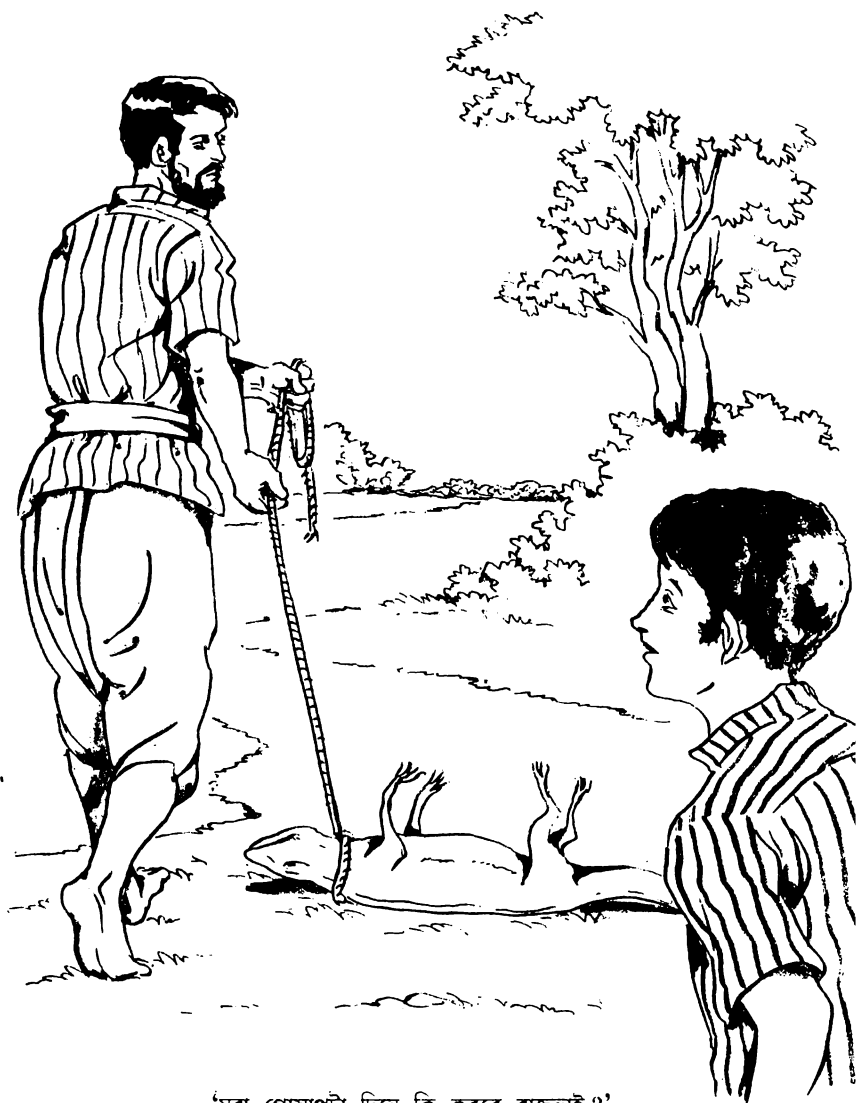
'মরা গোসাপটা দিয়ে কি করবে রাজুভাই?'

আমি বললাম, 'নদীর সৃষ্টি পলিমাটিকে মরুভূমির মতো দেখাচ্ছে। মাটি কিন্তু যথেষ্ট উর্বর, ইচ্ছে করলে এখানে সবরকম ফসলই ফলানো যেতে পারে।'

সূর্য অস্ত যেতেই আকাশ থেকে একটা প্রকান্ড ছায়া নেমে এসে বালুচরকে ঢেকে ফেলে। তারপর আস্তে আস্তে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।

আমি বললাম, 'অরুণদা বলছিলেন যে এমন কিছু এই চরের মধ্যে থাকতে পারে যা রাতের অন্ধকারে ফুটে ওঠে, কিন্তু দিনের আলোয় দেখা যায় না...'

টমাস বললে, 'তার মানে বালির মধ্যে এমন কিছু আছে, যা অন্ধকারে আলো বিকীরণ করে।'

'হয়তো তাই। চলুন না দেখি।'

'দাঁড়াও, আমার টর্চ ও পিস্তলটা সঙ্গে নিয়ে নিই...'

চরের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল টমাস। ভয়ার্তস্বরে সে বললে, 'কি যেন বালির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। যেন চরের বালিই জ্যান্ত হয়ে চলতে শুরু করেছে...'

টমাসের জ্যাকি কুকুরটা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে লেজ নাড়তে নাড়তে হেঁটে যাচ্ছিল, টমাস থামতে সেও থেমে পড়ে এবং লেজ গুটিয়ে কুঁই কুঁই করতে থাকে। স্পষ্ট বুঝতে পারি যে টমাস যাকে দেখে ভয় পেয়েছে, তাকে সে-ও দেখেছে এবং দেখে টমাসের চেয়েও বেশি ভয় পেয়েছে।

টমাস ও জ্যাকির দৃষ্টি অনুসরণ করে বালির নড়াচড়া আমিও দেখতে পাই, একটা সরলরেখায় বালি যেন এগিয়ে যাচ্ছে। বেশ দ্রুত যাচ্ছে একটি সরু স্রোতের মতো। বালির স্রোত এবং বালির এই দ্রুততালে এগিয়ে যাওয়াটাকে একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার বলে মনে হয়।

'ওটা কি?' টমাস আর্তস্বরে বলে ওঠে। জ্যাকিও তার নিজস্ব ভাষায় আর্তনাদ করতে থাকে।

হঠাৎ বালির মধ্যে থেকে আত্মপ্রকাশ করে একটি প্রকান্ড গোসাপ। চরের বালিই যেন এই গোসাপের রূপ নিয়েছে। আমাদের পুকুরের ধারে যে গোসাপ দেখেছিলাম তার তুলনায় আকারে অনেক বড়। বড় হলেও বেশ দ্রুতগামী। কাউকে লক্ষ্য করে যেন তেড়ে যাচ্ছে।

'ড্রাগন!' টমাস চাপা আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে।

'একে গোসাপ বলে।' আমি বললাম।

'ঐ দেখ, কি সাংঘাতিক...'

টমাসের গলার স্বরে আরও বেশি ভয় প্রকাশ পায়। অর্থাৎ আরও ভয়ঙ্কর কিছু দেখতে পেয়েছে সে। দেখতে আমিও পাই। একটা মাঝারি আকারের কেউটে সাপ, গোসাপের তাড়া খেয়ে তীরের বেগে ছুটে যাচ্ছে।

টমাস বললে, 'ড্রাগনটা ঐ কেউটে সাপটাকে তাড়া করেছে! সাপখেকো ড্রাগন বুঝি!'

'তাই তো দেখছি। হিংস্র বিযাক্ত কেউটেকে খেতে চলেছে, হিংস্রের চেয়েও হিংস্র...'

হঠাৎ ব্যাহত হলো গোসাপটির অগ্রগতি। অন্ধকার ফুঁড়ে একটা সরু বল্লম এসে বিঁধল গোসাপটির দেহে।

রক্তাক্ত দেহে বালির ওপরে লেজ আছড়াতে থাকে গোসাপটি। কেউটে সাপটিকে আর দেখা যায় না, গোসাপটি আহত হতেই সে পালিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

আহত গোসাপটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে আমি বললাম, 'কে মারল ওকে!'

টমাস বললে, 'আমার মনে হচ্ছে যে কেউটে সাপটাকে বাঁচাবার জন্যই ওকে কেউ মেরেছে।'

'এমন কেউটে সাপ প্রীতি সাধারণত দেখা যায় না। কে এই কেউটে সাপের বন্ধু, তাকে খুঁজে বের করতে হবে।'

খুঁজে বের করতে হয় না, সে নিজেই এসে হাজির হয়। অরুণের অন্যতম পাহারাওয়ালা রাজু মন্ডল। আমাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সে সোজা গোসাপটির ওপরে ঝুঁকে পড়ে এবং তার গায়ে বেঁধা বল্লমটা তুলে নিয়ে আঘাতের পর আঘাত হানে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নিস্পন্দ হলো গোসাপটি। কোমর থেকে দড়ি বের করে গোসাপটিকে বেঁধে ফেলল রাজু। তারপর তাকে টেনে নিয়ে যেতে উদ্যত হলো।

'দাঁড়াও।' আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'গোসাপটাকে ওরকম নিষ্ঠুরভাবে মারলে কেন, বলে যাও।'

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল রাজু। আমাদের দেখে এতই অবাক হলো যে প্রথমে তার মুখে একটাও কথা সরে না।

'চুপ করে আছ কেন, জবাব দাও।' আমি ধমকের সুরে বলে উঠি।

'বাস্তুসাপটারে বাচানের লাইগ্যা মারলাম।' রাজু বললে, 'গুইল সাপটা বাস্তুসাপটারে খাইতে চলছিল...'

'ঐ কেউটে সাপটা বাস্তুসাপ?'

'হ খোকাবাবু।'

'তোমাদের দারোগাঠাকুরের বাড়িতে সাপটা থাকে বুঝি?'

'আইজ্ঞা না। ঠারাইনের থানের সাপ, ঠারাইনের থান থেইক্যা বাইর অইয়া আসে।'

'ঠারাইনের থান মানে অষ্টভুজার মন্দির তো? কেউটে সাপটা বুঝি মন্দিরের বাস্তুসাপ?'

'হ খোকাবাবু।'

'মন্দির থেকে বেরিয়ে এসেছে তো?'

'হ।'

'কোথায় মন্দির?'

'হে আমি ক্যাম্বায় কমু? মাটির তলে কনে আসে কে জানে?'

'তাহলে তুমি জানলে কি করে ওটা মাটির তলার মন্দিরের বাস্তুসাপ?'

'আমি জানি না খোকাবাবু, জানেন তেনি—দারোগাঠাকুর।'

'তার মানে তোমাদের দারোগাঠাকুর জানেন কোথায় আছে মন্দির?'

'হে আমি জানি না খোকাবাবু।' রাজু জবাব দিল, 'দারোগাঠাকুররে গিয়া জিগায়েন। তয় চলেন আমার লগে।'

'এখন নয়, পরে যাব।' আমি বললাম।

আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে রাজু বললে, 'এই সাঁঝের কালে চরের মধ্যে কর কি খোকাবাবু?'

'কি আবার করব, ঘুরে বেড়াচ্ছি।' আমি জবাব দিলাম, 'আমার সঙ্গে উনিও বেড়াচ্ছেন।'

অন্ধকারের মধ্যে টমাসকে দেখতে না পেলেও তার কোমরে গোঁজা পিস্তলটি রাজুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকার পর সে বললে, 'এনার কাঁছে পিস্তল আসে দেহি!'

'তা আছে বলেই আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে চরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে পারছি।'

'আমি অহন (এখন) চলি খোকাবাবু।'

বলে মরা গোসাপটিকে দড়ি দিয়ে টানতে টানতে চলতে শুরু করে রাজু।

'মরা গোসাপটা দিয়ে কি করবে রাজুভাই?' আমি প্রশ্ন করি।

'চামড়া দিয়া জুতা বানামু। গুইল সাপের চামড়া দিয়া সরেস জুতা হয়।'

রাজু চলে গেলে পর রাজুর সঙ্গে আমার কথোপকথনের সারমর্ম টমাসকে বুঝিয়ে বলি।

'ঐ সাপটা তাহলে অষ্টভুজার মন্দিরের সাপ!' টমাস উত্তেজিত স্বরে বললে।

'শ্যামাপদবাবু ও রাজুর তাই ধারণা।' আমি বললাম, 'কেউটে সাপেরা পুরনো বাড়ির ভাঙা দেয়ালের ফাটলে থাকতে ভালবাসে বলেই এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। এ জায়গাটি শ্যামাপদবাবুর বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে অবস্থিত, কাছাকাছি মাটির ওপরে কোনো ঘরবাড়ি নেই, কাজেই এখানে চরের বালিতে চাপা পড়া মন্দিরকে কেউটে সাপের আস্তানা বলে ধরে নেওয়া হয়।'

'অর্থাৎ এখানেই কোথাও মন্দিরটা বালির তলায় চাপা আছে!'

'নাও হতে পারে। হয়তো ঐ সাপটা আদৌ কোনো বাস্তুসাপ নয়, হয়তো বালির মধ্যে কোনো গর্তে তার আস্তানা। অবশ্য রাজুভাই ও দারোগাবাবু যখন ঐ সাপটাকে বাস্তুসাপ বলে চিনেছে, তখন তাকে বাস্তুসাপ বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে।'

'ঠিক তাই। এস আমরা এখানে খোঁজাখুঁজি শুরু করি। এই অন্ধকারের মধ্যে তো কোনো কাজ করা যাবে না, এস জায়গাটাকে চিহ্নিত করে দিই।'

বলে টমাস তার কাঁধের ঝোলা থেকে জমি জরিপ (survey) করার জন্য ব্যবহার করা একটি লোহার নিশান বের করল। তারপর নিশানটি বালির মধ্যে পুঁতে দেবার জন্য জায়গা বাছতে গেল।

।। সাত ।।
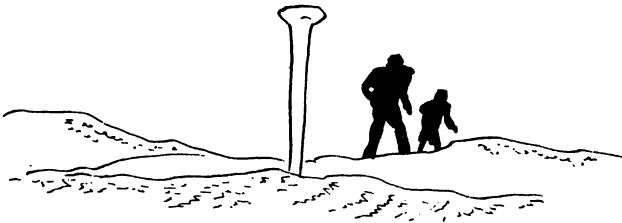
অদূরে বালির মধ্যে গোল আকারের একটি ঢিবি রয়েছে, অন্ধকারের মধ্যেও তাকে স্পষ্ট চেনা যায়। টমাস বললে, 'এই চরের মধ্যে ওই ঢিবিটা একটা ল্যান্ডমার্ক, একটানা বালির মধ্যে একে অনায়াসে সনাক্ত করা যায়। কাজেই এই ঢিবির ওপরেই নিশানটা পুঁতে দেওয়া যাক।'

আমি বললাম, 'ঢিবিটাই তো একটা নিশান, ওখানে নিশান পুঁতে দেওয়ার দরকার কি!'

'এরকম ঢিবি হয়তো আরও আছে এই চরের মধ্যে। কাজেই নিশানটি পুঁতে দেওয়া উচিত। চল ঢিবির ওপরে উঠে নিশানটা লাগিয়ে দিই।'

ঢিবির ওপরে উঠে একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পাই। ঢিবির ওপাশে বালি ফুঁড়ে আলো বেরিয়ে আসছে। আকাশ-মাটিজোড়া কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার, তার মধ্যে এই আলো সত্যিই বিস্ময়কর। মনে হচ্ছে, বালির মধ্যে এমন কিছু আছে যা আলো বিকিরণ করছে।

টমাস ও আমার মতো টমাসের জ্যাকি কুকুরও ঝুঁকে পড়ে তাকিয়েছিল ঐ আলোর দিকে। এই আলো দেখে এমনই ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল যে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যায় সে। ঢিবিটা খাড়া নেমে গিয়েছে আলো বিকিরণকারী বালির দিকে, জ্যাকি সোজা ঐ বালির মধ্যে গিয়ে পড়ে।

তারপর ঘটল একটা অদ্ভুত ব্যাপার। অদ্ভুত এবং ভয়ঙ্কর। ঐ আলো-বিকিরণকারী বালি গ্রাস করে ফেলে জ্যাকিকে। সে ঐ বালির ওপরে পড়ামাত্র বালি তাকে যেন গিলে ফেলে।

'জ্যাকি!' টমাস আর্তনাদ করে ওঠে।

'চোরাবালি!' আমি রুদ্ধশ্বাসে বলি, 'চোরাবালি জ্যাকিকে গ্রাস করেছে।'

ডুবেই কিন্তু ভেসে উঠল জ্যাকি। বালির মধ্যে ডুবে বালির ওপরে ভেসে ওঠা যেন জলের ওপরে ভেসে ওঠা। তারপর সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে পা ছুঁড়তে থাকে সে। সত্যি সত্যিই বালির ওপরে সাঁতার কাটতে থাকে সে।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল চোরাবালি সম্পর্কে লেখা একটা প্রবন্ধের কথা। তাতে লেখা আছে যে চোরাবালি হচ্ছে কোনো জলের আধারে জমা বালি। জলের আধার মানে নদী, হ্রদ বা পুকুর। তাতে বালি জমে জলের জায়গা নেয়। অর্থাৎ চোরাবালি হচ্ছে বালির নদী, হ্রদ বা পুকুর। তার মধ্যে পড়লে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় বালির মধ্যে সাঁতার কাটা। জ্যাকি তাই করছে। সাঁতার কাটতে কাটতে সে এই ঢিবির নিচে আসে। ঢিবির শক্ত ডাঙার নাগাল পেয়েই সে উঠে দাঁড়ায়। তারপর ছুটতে ছুটতে ঢিবির ওপরে আমাদের কাছে আসে।

প্রায় সুনিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে জ্যাকি। তাকে ফিরে পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে টমাস তাকে কোলে তুলে নিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে।
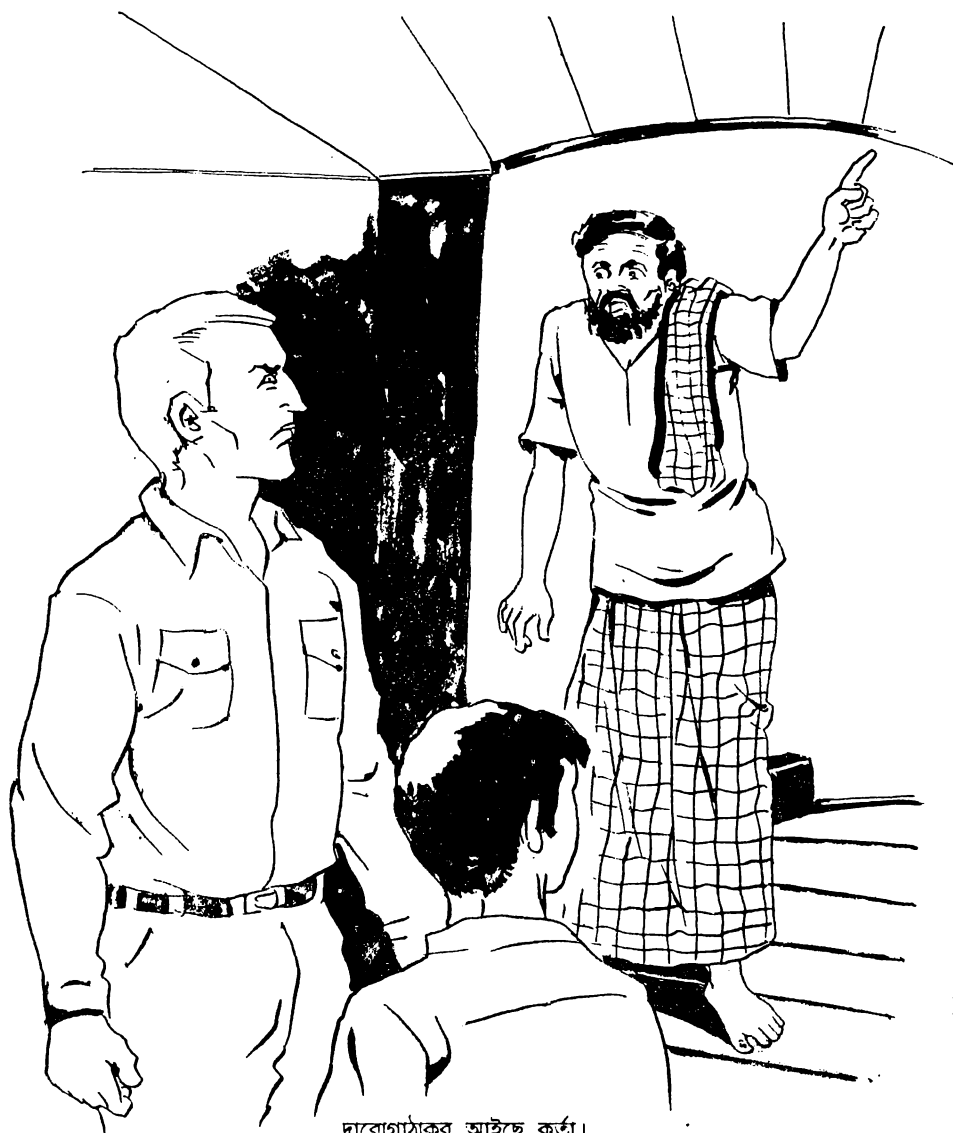
দারোগাঠাকুর আইছে কর্তা।

ঢিবি থেকে নামবার আগে নিশানটা পুঁতে দিতে ভোলে না টমাস। সে বললে, 'এই নিশান দেখে চোরাবালিটাকে চিনে নিতে পারব। চোরাবালিটা আমাদের পক্ষে খুবই জরুরি ব্যাপার।'

‘নিশ্চয়ই।’ আমি বললাম, ‘এই চোরাবালির খপ্পরে পড়া আমাদের পক্ষে মারাত্মক। বালির মধ্যে জ্যাকির মতো আমরা কি পারব সাঁতার কাটতে!’

‘জানি না। চোরাবালির মধ্যে তো কখনো সাঁতার কাটিনি।’

বজরাতে ফিরে আসি আমরা। খানসামা এসে বললে যে খাবার তৈরি। খেতে বসার আগে টমাস নিজের হাতে জ্যাকিকে রুটি-মাংস খাওয়াল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমরা শোবার কামরায় আসি। কামরায় আর একটা খাট ছিল, তাতে আমার জন্য বিছানা পাতা হয়েছে।

খানিকক্ষণ গল্পগুজব করার পর আমরা শুতে যাচ্ছি, এমন সময় বজরার মাঝি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তেজিত স্বরে বললে, ‘দারোগাঠাকুর আইছে কর্তা।’

‘খুবই ভাল কথা।’ টমাস বললে, ‘তাঁকে বসার ঘরে নিয়ে এস, আমরা যাচ্ছি।’

বসার ঘরে শ্যামাপদ অবশ্য বসেনি, দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের দেখামাত্র টমাসের উদ্দেশে আভূমি নত হয়ে অভিবাদন জানালেন।

টমাস বললে, ‘ভেবেছিলাম কাল সকালে আপনার সঙ্গে দেখা করব। আপনি যে আমাদের হদিস পেয়ে রাত দুপুরেই ছুটে আসবেন তা আমি ভাবিনি।’

দু'হাত কচলাতে কচলাতে শ্যামাপদ বললেন, ‘এত রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি খুবই দুঃখিত স্যার। কিন্তু রাজু মন্ডলের কাছে যখন শুনলাম যে ডি. এস. পি. সাহেবের বজরা বালিয়াড়ির ধারে এসে নোঙর করেছে, তখন ছুটে এলাম হুজুরে হাজির হবার জন্য। কিন্তু হুজুর তো আসেননি, এসেছেন আপনি। হুজুরের বজরা নিয়ে এসেছেন, কাজেই আপাতত আপনিই আমার হুজুর। বলুন, কিসের জন্য আপনার আগমন, নিছক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে এসেছেন কি?’

‘ভ্রমণ ঠিক নয়, ঐতিহাসিক সন্ধানে এসেছি। এখানকার চরের বালির তলায় অষ্টভুজা দেবীর মূর্তি চাপা আছে, আমি তাকে উদ্ধার করতে চাই।’

‘উদ্ধার তো ‘ঢাকার ইতিহাস’ প্রণেতা যতীন্দ্রমোহন করতে চাইছেন। তাঁর সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হয়নি?’

‘হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর এসেছি এখানে। এখন আপনাদের সাহায্যে খোঁজাখুঁজি শুরু করতে চাই। আপনাদের মানে আপনি, আপনার মেয়ে ও অরুণাভ চক্রবর্তী নামে যে রাজবন্দী আপনার হেফাজতে রয়েছে সেই যুবকটি, আপনাদের তিনজনেরই সাহায্য চাই আমার। ভাল কথা, আপনাদের ডি. এস. পি. আপনাকে একটি চিঠি দিয়েছেন। এই সেই চিঠি...’

বলে নিজের পোর্টফোলিও ব্যাগ থেকে একটি চিঠি বের করে শ্যামাপদর হাতে দিল টমাস।

চিঠিটা পড়ে আবার আভূমি নত হয়ে অভিবাদন জানালেন শ্যামাপদ। গদগদ স্বরে বললেন, ‘সাহেব আমাকে হুকুম দিয়েছেন আপনাকে সবরকম সাহায্য করার জন্য। আমার যথাসাধ্য অবশ্যই করব, অরুণকেও বলে দেব আপনার কাজে সামিল হবার

জন্য। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে চাই। মাটিতে যা চাপা আছে, তা মাটিতেই চাপা থাক না। তাকে উদ্ধার করে লাভ কি?'

'লাভ কি তা কি আপনি জানেন না?' টমাস বললে, 'চক্ষুহীন মূর্তিকে তার চোখ ফেরত দেব। তারপর চরের মধ্যে উপযুক্ত মন্দির গড়ে তুলে তাতে দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করব।'

'কিছু মনে করবেন না স্যার, আপনি বিদেশী খ্রীস্টান, আপনার দেওয়া চোখ দিয়ে দেবীমূর্তি প্রাক্তন রূপ ফিরে পেলেও দেবত্ব হারাবে। মানে সেই দেবীমূর্তিকে আর কেউ পূজা করতে চাইবে না। অতএব, আমি বলেছিলাম যে দেবী যেমন আছেন, তেমনই থাকুন। মাটি-চাপা চক্ষুহীন দেবীই আমাদের পূজনীয়া, তাঁকে নিয়ে নাড়াচাড়া আর নাই বা করলাম।'

'নাড়াচাড়া তো করতে চাই না, আপনাকে আমি চোখ দুটি দিয়ে দেব, আপনি তা লাগিয়ে দেবেন যথাস্থানে। স্থানীয় লোকেরা তা মেনে না নিলে মূর্তিটিকে ঢাকার যাদুঘরে পাঠিয়ে দেব।'

'শুনুন হুজুর, মাটিতে চাপা থাকলেও অষ্টভুজাকে খুবই জাগ্রত দেবী বলে মানে এ অঞ্চলের নরনারীরা। তাদের ধর্মীয় সংস্কারের মূলে আঘাত হানা কি উচিত হবে?'

'দেবীর চোখ দুটি দেবীকেই ফেরত দেব। তাতে স্থানীয় লোকেদের ধর্মীয় সংস্কার আহত হলে আমার কিছু করার নেই। আমার কর্তব্য আমাকে করতেই হবে শ্যামাপদবাবু...'

'ঠিক আছে, করুন আপনার কর্তব্য।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন শ্যামাপদ, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করতে আমি বাধ্য, অতএব আমার সাহায্য আপনি পাবেন...'

টমাস বললে, 'একটা কাজ করা যাক, এ ব্যাপারে যা করার আপনিই করুন, লোকে জানুক যে মূর্তিটিকে আপনিই খুঁজছেন এবং খুঁজে বের করা হলে পর সকলে জানুক যে মূর্তিটিকে আপনিই খুঁজে বের করেছেন। চোখ দুটি আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি, মূর্তি উদ্ধার হলে পর সবাইকে বলবেন যে চক্ষুষ্মতী দেবীমূর্তিই উদ্ধার করেছেন আপনি। তারপর শাস্ত্রসম্মত অনুষ্ঠান করে মূর্তিটিকে প্রতিষ্ঠা করবেন। মন্দির আমিই তৈরি করিয়ে দেব।'

মাথা চুলকোতে চুলকোতে শ্যামাপদ বললেন, 'এর মধ্যে আমাকে টানছেন কেন স্যার? আমি আমার কাজকর্ম, পুজো-আর্চা নিয়ে থাকি, আমার সময় কোথায়?'

মৃদু হেসে টমাস বললে, 'আপনাকে কিছু করতে হবে না, যা করার সব আমরাই করব। এ কাজ আপনি করেছেন বলে এখানকার লোকেদের মধ্যে প্রচার করা হবে শুধু। মূর্তি উদ্ধার হলে পরই অবশ্য তা করা হবে। এ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আপনি অরুণকে পাঠিয়ে দিন আমার কাছে।'

'অন্তরীণ রাজবন্দী, তাকে কোনো কাজে লাগানো কি ঠিক হবে?'

'আমার ডি. এস. পি. বন্ধুর তরফ থেকে আমি ওকে কাজে লাগাব, কাজেই চিন্তার কোনো কারণ নেই। ওকে কাজে লাগালে ওর দায়িত্ব আমিই নেব।'

'দেখবেন স্যার, আমি যেন কোনো বিপদে না পড়ি।'

টমাস বললে, 'কাল সকালে আমাদের প্রথম কাজ হবে আপনার বাড়ি গিয়ে অরুণের সঙ্গে দেখা করা।'

'সে তো খুব ভাল কথা।' শ্যামাপদ গদগদ স্বরে বললেন, 'আমার অশেষ সৌভাগ্য, আমার কুঁড়েঘরে আপনার মতো মানী লোকের পায়ের ধুলো পড়বে। এখন আমি চলি স্যার...'

'এখনই যাবেন কি! একটু চা বা কফি...তামাক যদি ইচ্ছে করেন...'

'না স্যার, না।' শ্যামাপদ শিউরে উঠলেনঃ 'চা বা তামাক আমি স্পর্শ করি না। তা ছাড়া...'

'তা ছাড়া আমার এখানে কিছু খেলে আপনার জাত যাবে...তাই না?' মৃদুমন্দ হাসতে থাকে টমাস। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'তোমার জাত বোধহয় আজ রাত্রেই চলে গেল!'

'গেল বুঝি!' আমিও হাসতে হাসতে বলি, 'কই সেরকম কিছু তো অনুভব করছি না!'

ধারে-কাছেও চাইনে যেতে।

শ্যামাপদ বললেন, 'অনেক রাত হলো স্যার, আমাকে ছেড়ে দিন...'

টমাস বললে, 'রাত করেই তো এসেছেন, রাত হওয়ার অজুহাত দিলে মানবো কেন! একটু বসুন। ওহো, ভুলেই গেছিলাম যে আমার এখানে বসলেও আপনার জাত যাবে! ঠিক আছে, বসতে হবে না, দাঁড়িয়েই আমার দু-একটি কথা শুনুন। ঘণ্টা কয়েক আগে সন্ধ্যার পরে একটা অতিকায় গিরগিটিকে দেখেছিলাম একটি কেউটে সাপকে তাড়া করতে। আপনার রাজু মন্ডল গিরগিটিটাকে মেরে কেউটে সাপটাকে বাঁচাল, কারণ কেউটে সাপটা একটা বাস্তুসাপ। সাপটা নাকি এই বালুচরের নিচে মন্দিরে থাকে। রাজু মন্ডল বলছিল যে আপনি নাকি নিজের চোখে ঐ সাপটাকে মাটির তলার মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছেন...'

'না না, কক্ষণো না!' শ্যামাপদ ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'রাজু বাজে কথা বলছে। আপনি বিশ্বাস করুন স্যার, মাটিতে চাপা মন্দিরের কোনো খবরই আমি রাখি না, বা রাখার চেষ্টা করি না।'

'তার মানে ঐ সাপটা বাস্তুসাপ নয়?'

'না না, সে কথা আমি বলছি না। এ অঞ্চলের অধিকাংশ কেউটে সাপই বাস্তুসাপ, অতএব ঐ সাপটাও বাস্তুসাপ হতে পারে। মাটির নিচে চাপা পড়া কোনো বাস্তুতে হয়তো তার বাস...'

'বাস্তুটা হয়তো অষ্টভুজার মন্দির—কি বলেন?'

'আমি কি বলব স্যার! এ সম্পর্কে আমি কখনোই কিছু জানার চেষ্টা করিনি। আপনাকে আগেই বলেছি, যে দেবী মাটির নিচে বিরাজ করছেন, তাঁর উদ্দেশে আমার পূজাপাঠ চললেও তিনি কোথায় আছেন তা জানার চেষ্টা আমি কখনোই করব না।'

'আচ্ছা শ্যামাপদবাবু এখানকার চোরাবালির খবর রাখেন?'

'হ্যাঁ, রাখি, মানে আছে জানি। তবে কোথায় আছে বলতে পারব না।'

'আমরা কিন্তু বলতে পারব। একটু আগে তা আবিষ্কার করেছি। আপনি যদি চান আপনাকে তার কাছে এখনই নিয়ে যেতে পারি...'

'না না।' শ্যামাপদ শিউরে উঠে বললেন, 'ওর ধারে-কাছেও চাইনে যেতে। দোহাই আপনাদের, দয়া করে আপনারাও যাবেন না ওর কাছে।'

আমি বললাম, 'যাব না ভাবলেই কি ওকে এড়ানো যাবে! আজ তো আমরা আমাদের অজান্তেই ওর মুখোমুখি হয়েছিলাম। মিস্টার টমাস-এর কুকুরটা তো ওর মধ্যে পড়েই গিয়েছিল! অনেক কষ্টে বালির মধ্যে সাঁতার কেটে সে নিজেকে ওর ভেতর থেকে উদ্ধার করেছে!'

'তাই নাকি!' শ্যামাপদ অবাক হয়ে বললেন, 'বালির মধ্যে সাঁতার কাটা যায়!'

'যায় যে সে তো আমরা স্বচক্ষেই দেখলাম।'

'তোমরা যা দেখেছ, আমি তা কখনোই দেখতে চাই নে। চোরাবালি চোরাবালিতেই থাক, তাকে আমি দূর থেকেই প্রণাম করে যাব...'

'প্রণাম করে যাবেন কেন?' টমাস উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল শ্যামাপদর মুখের দিকেঃ চোরাবালি কি আপনার প্রণম্য?'

'হ্যাঁ।' শ্যামাপদ জবাব দিলেন, 'এখানকার সবকিছুই আমার প্রণম্য, কারণ এই বালুচরের প্রতিটি বালুকণা অষ্টভুজা দেবীর সান্নিধ্যে পবিত্র হয়ে উঠেছে। গোটা বালুচরটাই দেবীর স্থান।'

টমাস বললে, 'চোরাবালির বালির মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছি। এমনটি কোথাও কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না...'

'কি?'

'একটা অদ্ভুত আলো। জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে বালির স্তর, কিন্তু আকাশে চাঁদ নেই, অর্থাৎ বালি ফুঁড়ে আলো বেরিয়ে আসছে।'

'মায়ের আলো!' শ্যামাপদর গলার স্বর কেঁপে ওঠেঃ 'অষ্টভুজার জ্যোতি...'

চোরাবালি থেকে বিকীর্ণ আলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই শ্যামাপদর। টমাস এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে থেমে গেল তার ভক্তিগদগদ ভাব দেখে।

আবেশ জড়ানো স্বরে তিনি বললেন, 'স্বয়ংপ্রকাশ আলো...তাঁরই আলো...এই আলো দেখেছেন আপনারা...আপনারা ধন্য...'

টমাস বললে, 'আমাদের মতো আপনিও ধন্য হতে পারেন। চলুন, এই আলো আপনাকেও দেখিয়ে দিই।'

'না না! এই আলো আমি সইতে পারব না। মায়ের আলো বা অষ্টভুজার জ্যোতি, যাই হোক না কেন, এ ভূতুড়ে আলো...আমি যাই...'

'চলুন আপনাকে এগিয়ে দিই...'

শুধু টমাস নয়, তার জ্যাকি কুকুরও শ্যামাপদকে এগিয়ে দেবার জন্য এগিয়ে যায়। আমি তাদের সঙ্গে যেতে চাইলাম, কিন্তু টমাস বাধা দিয়ে বললে, 'না, তোমাকে যেতে হবে না, তুমি এখন শুয়ে পড়...'

টমাস শ্যামাপদকে এগিয়ে দিয়ে বজরাতে ফিরে আসার আগেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম...

॥ আট ॥

'শ্যামাপদবাবু বলেন, ভুতুড়ে আলো...আমরা দেখেছি, চোরাবালি ফুঁড়ে ওঠা আলো...তুমি কি বল?'

অরুণকে এই প্রশ্ন করে টমাস।

শ্যামাপদর বাড়ির বাইরে বাগানের মধ্যে চেয়ার পেতে বসে আমরা ঢিবির পাশে চোরাবালি এবং চোরাবালি থেকে বেরিয়ে আসা আলো নিয়ে আলোচনা করছি। শ্যামাপদ পুজোয় বসেছেন, কাজেই আমাদের আলোচনায় তিনি অনুপস্থিত। অনুপস্থিত অবশ্য নীলাও, কারণ সে আমাদের জন্য খাবার তৈরি করছে। টমাস, অরুণ ও আমি, আমরা তিনজনে মিলে চোরাবালির আলোর রহস্যভেদের চেষ্টা করছি।

অরুণ বললে, 'ভুতুড়ে আলো বলে কিছু নেই, ঐ আলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অবশ্যই আছে। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা হয় না।'

টমাস বললে, 'তা হলে তোমার বুদ্ধি দিয়ে এই আলোর ব্যাখ্যা কর।'

'এই আলো তো আমি চোখে দেখিনি।'

'চোখে দেখতে হলে রাত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

'তা তো হবেই। অন্ধকার না হলে তো এ আলো ফুটবে না। আপাতত অবশ্য দিনের আলোয় জায়গাটি দেখে আসা যেতে পারে।'

'ঠিক বলেছ। দিনের আলোয় চোরাবালি পরীক্ষা করে চোরাবালির মধ্যে প্রচ্ছন্ন স্বয়ংপ্রভ বস্তুকে চিনে নেওয়া যেতে পারে। চল, এখনই যাই।'

'একটু অপেক্ষা করুন, নীলা খাবার করে নিয়ে আসছে, সেই খাবার খেয়েই যাব আমরা।'

বেশিক্ষণ অবশ্য অপেক্ষা করতে হলো না, একটু বাদেই নীলা এল লুচি-তরকারি ও মিষ্টি নিয়ে। মাটিতে আসন পেতে কলাপাতা বিছিয়ে তা-ই পরিবেশন করলে সে আমাদের।

খাওয়ার পর অরুণ বললে, 'চলুন, এখন যাই আমরা।'

নীলা বললে, 'আমিও যাব।'

ভুরু কুঁচকে নীলার মুখের দিকে তাকিয়ে অরুণ বললে, 'তুমিও যাবে মানে! আমরা কোথায় যাব জান?'

'না। জানার দরকারও নেই, যেখানেই যাও, সেখানেই যাব।'

'আমরা যাব চোরাবালি দেখতে। মিস্টার টমাস রাইট ও সন্তু গতরাত্রে চোরাবালির কাছে গিয়েছিল, এখন দিনের আলোয় পরীক্ষা করতে চাই আমরা। তুমি জান নিশ্চয়ই, চোরাবালি কি রকম ভয়ানক জিনিস!'

'জানি বই কি। কিন্তু তবু যাব, কারণ তোমরা যাচ্ছ।'
'তোমার ভয় করবে না?'

কোমরের খাপ থেকে পিস্তল বের করে দেখাল তাদের।

'সন্তু ঐটুকু ছেলে, তার যদি ভয় না করে, আমারও করবে না।'
বোঝা গেল যে নীলা আমাদের সঙ্গে যাবেই, অতএব তাকে নিয়েই বেরিয়ে

পড়ি আমরা। রাজু মন্ডল এবং কালু মিঞাও আমাদের সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু টমাস তাদের বাধা দিয়ে বললে, 'তোমাদের যাবার দরকার নেই, তোমাদের স্বদেশীবাবুর পাহারাদারের কাজ আমিই করব।'

বলে সে তার কোমরের খাপ থেকে পিস্তল বের করে দেখাল তাদের।

রাজু বললে, 'দারোগা ঠাকুররে জিগাইয়া আহি...'

'জিজ্ঞেস করতে হবে না।' অরুণ বাধা দিয়ে বললে, 'তোমার দারোগা ঠাকুরেরও ঠাকুর ইনি, মিলিটারি সাহেব, মাদারীপুরের ডি. এস. পি-র বন্ধু।'

এরপর রাজু ও কালু আর কিছু বলার সাহস পেল না।

অরুণ টমাসকে বললে, 'যদি অনুমতি দাও, একটা জিনিস আমার সঙ্গে নেব।'

'কি জিনিস?' টমাস গম্ভীর গলায় বললে, 'বোমা-পিস্তল নয় তো?'

বলতে বলতে মুখ টিপে হেসে ফেলে সে।

'না। সম্পূর্ণ নির্দোষ একটা ক্যানভাসের থলি। থলির মধ্যে কয়েক শিশি রাসায়নিক পদার্থ আছে, যাদের সাহায্যে মাটি বা বালি পরীক্ষা করা যেতে পারে।'

'খুব ভাল। এখন চল...'

চরের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে আখের ক্ষেত পেরিয়ে যাই। আখের ক্ষেত পেরোতেই নদীর ধারে সেই বালির ঢিবি চোখে পড়ল। কাছাকাছি এরকম গোল আকার ঢিবি আর নেই। কাজেই কোনো সন্দেহ থাকে না যে সেই একই ঢিবির দিকেই যাচ্ছি আমরা।

ঢিবির ওপরে উঠে টমাসের পুঁতে দেওয়া নিশানটি চোখে পড়ল। টমাস খুশি হয়ে বলল, 'নিঃসন্দেহে সেই ঢিবিতেই পৌঁছে গিয়েছি আমরা।'

ঢিবি খাড়া হয়ে নিচে নেমে গিয়েছে। নিচের ঐ বালিতে পড়ে গিয়ে ডুবতে বসেছিল জ্যাকি, তারপর সাঁতার কেটে নিজেকে বাঁচিয়েছিল। অতএব ঐ বালিই চোরাবালি। চারপাশের বালির তুলনায় ঐ বালির মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করি।

পার্থক্য আছে। জমাটবাঁধা পলি নয়, শুধু বালি। তার রঙ ফ্যাকাশে সাদা থেকে হলুদ।

অরুণ বললে, 'নিচে নেমে গিয়ে কাছের থেকে পরীক্ষা করা যাক।'

সাবধানে নিচে নামি আমরা। চোরাবালিতে যাতে পা না পড়ে তার জন্য ঢিবি ঘেঁষে দাঁড়াই। এলোমেলো ঢেউ-খেলানো বালি অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। অনেক দূর হলেও একটা নির্দিষ্ট সীমা যেন চোখে পড়ে। চারপাশে মোটামুটি চৌকো আকারের একটি এলাকাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো সুপারি ও নারকেলের গাছ। সুপারি ও নারকেল গাছ দিয়ে ঘেরা এলাকাটিই যেন চোরাবালির এলাকা।

সত্যিই চোরাবালি কিনা পরীক্ষা করতে হলে বালির মধ্যে নামতে হবে। টমাস আজ জ্যাকিকে সঙ্গে আনেনি, অতএব আমাদের মধ্যে একজন বালিতে নামলেই বালিটা চোরাবালি কিনা বোঝা যাবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কে নামবে বালিতে?

হঠাৎ অরুণ এগিয়ে গিয়ে বললে, 'আমি নামব।'

বলে কাঁধে ঝোলানো থলিটা সে নীলার হাতে দিল। তারপর ভাল করে মালকোঁচা মেরে এগিয়ে গেল বালির মধ্যে।

এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ডুবে যেতে উদ্যত হলো অরুণ। চোরাবালির গ্রাসের মধ্যে পড়েছে সে। নীলা চিৎকার করে ওঠে।

চোরাবালির মধ্যে পুরোপুরিই ডুবে গেল অরুণ। তারপর প্রাণপণ দুহাতে দুপাশের বালির মধ্যে চাপ দিয়ে সে বালির ওপরে উঠে এল এবং উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল বালির ওপরে।

তারপর শুরু হলো বালির ওপরে সাঁতার কাটা। চোরাবালি জলের মতো অরুণকে ডুবিয়ে ফেলতে চায়—হাত ও পা চালিয়ে সে তার দেহটাকে ভাসিয়ে রাখে। প্রাণপণ শক্তিতে দু-হাত দিয়ে বালি কেটে কেটে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় সে।

বালির মধ্যে সাঁতার কাটা যে সম্ভব তা কল্পনাও করিনি কখনো আগে। অরুণ অনায়াসে চোরাবালির ওপরে সাঁতার কাটছে এবং পারাপার হচ্ছে, অর্থাৎ চোরাবালির এপার থেকে ওপারে যাচ্ছে। চোরাবালির এলাকাকে সাঁতার কেটে প্রদক্ষিণ করে সে প্রমাণ করল যে চোরাবালি একটা ছোটখাটো হ্রদ বা পুকুরের আকারে বিন্যস্ত।

চোরাবালিতে সাঁতার কাটা শেষ করে ফিরে এল অরুণ। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। বেশ কিছুক্ষণ বসে বসে বিশ্রাম করার পর সে বললে, 'মনে হচ্ছে যে এখানে একটা পুকুর ছিল। বালি জমে জমে পুরু চোরাবালির স্তর গড়ে উঠেছে পুকুরের মধ্যে।

তারপর চোরাবালি থেকে নমুনা তুলে পরীক্ষা করে অরুণ। তার থলি থেকে রাসায়নিক পদার্থগুলো বের করে একে একে বালির ওপরে প্রয়োগ করে। বালির মধ্যে ক্যালসিয়াম এবং ফসফেটের লক্ষ্মণ দেখতে পায় সে। রাতের আঁধারে চোরাবালি থেকে যে আলো বিকীর্ণ হতে দেখেছি, তার উৎস বালির সঙ্গে মিশে থাকা এই ফসফেট। ফসফেটের ফসফরাস স্বতস্ফূর্তভাবে আলো বিকীর্ণ করে অন্ধকারের মধ্যে আলো সঞ্চার করে। স্পষ্টত এই ক্যালসিয়াম ও ফসফেট এসেছে ঝিনুক, শামুক এবং মাছের দেহাবশেষ থেকে। অর্থাৎ চোরাবালির আড়ালে চাপা পড়া পুকুরের ঝিনুক, শামুক ও মাছ বালির মধ্যে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাসের সমাহরণ (concentration) ঘটিয়েছে। এর পর আর কোনো সন্দেহ থাকে না যে একটা বালি-চাপা পুকুরের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি।

॥ নয় ॥
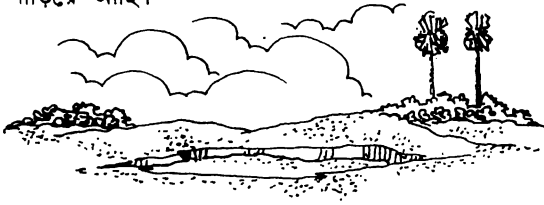
অরুণের চোরাবালি পরীক্ষার ফল জানার পর আমি বললাম, 'জ্যাঠামশাই বলেছিলেন যে অষ্টভুজার মন্দিরের সামনে একটা পুকুর ছিল, পুকুরে প্রচুর মাছ ছিল....'

'সেই পুকুরই হয়তো এটা।' অরুণ বললে, 'হয়তো কাছাকাছি অষ্টভুজার মন্দির বালিতে চাপা রয়েছে। আমার মনে হচ্ছে এখানে একটু খোঁজাখুঁজি করলেই মন্দিরটাকে খুঁজে বের করতে পারব আমরা।'

টমাস বললে, 'গতকাল সন্ধ্যায় যে বাস্তুসাপটাকে দেখেছি, তাকে অনুসরণ করে হয়তো ঐ মন্দিরে পৌঁছে যেতে পারি। কিন্তু তার দেখা কি আর পাব!'

অরুণ বললে, 'দয়া করে যদি সে দেখা দেয়, তবেই দেখা পাবেন।'

আমি বললাম, 'গোসাপ দেখা দিলে বাস্তুসাপ দেখা দিতে পারে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, যেখানে গোসাপ, সেখানেই সাপ। গোসাপের খাদ্য হবার জন্য সাপ এগিয়ে আসে, অর্থাৎ গোসাপের খাদ্য হয়ে তার সাপজন্ম যেন সার্থক হয়।'

অরুণ বললে, 'সাধারণত জলা বা পুকুরের ধারে গোসাপ থাকে। এখানে গোসাপ কেউটে তাড়া করেছিল, এর থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে নিকটেই কোনো জলা বা পুকুর আছে। অর্থাৎ চোরাবালি চাপা এই জায়গাটা যে পুকুর তার আর একটি প্রমাণ গোসাপের অস্তিত্ব।'

টমাস বললে, 'সে যাই হোক, অষ্টভুজার মন্দির কোথায় ছিল তার হদিস বোধহয় পেয়ে গেলাম।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে।' অরুণ বললে, 'এখন মন্দিরের দিকে মন দেওয়া যেতে পারে। মানে মন দিয়ে খোঁজা যেতে পারে।'

টমাস বললে, 'পুকুরের কোন ধারে মন্দিরটা ছিল জানতে পারলে এই চোরাবালির এলাকার সেইদিকে খোঁজাখুঁজি করা যেতে পারে। যতীনবাবুর কাছে গিয়ে জেনে আসলে হয়....'

'বাবাও জানতে পারেন।' নীলা বললে, 'বাবার কাছ থেকে অরুণদা ও আমি জেনে আসতে পারি।'

অরুণ বললে, 'সেই ভাল। শ্যামাপদবাবুর কাছ থেকে জেনে আসা যাক। নীলার আমার সঙ্গে যাওয়ার দরকার নেই, আমি একাই যাব।'

'না, সে হয় না।' নীলা গম্ভীর মুখে বললে, 'তোমাকে একা ছেড়ে দিলে বাবা রাগ করবেন।'

টমাস বললে, 'ঠিক বলেছ, অরুণকে একা ছেড়ে দেওয়া যায় না। চল, আমরাও যাই ওর সঙ্গে।'

আমি বললাম, 'তার আগে এই চোরাবালির চারপাশে ঘুরে দেখলে হয় না? জ্যাঠামশাই বলছিলেন যে মন্দিরের সামনেই ছিল পাথর দিয়ে বাঁধানো ঘাট—খুঁজলে হয়তো ঐ ঘাটের আভাস পাওয়া যেতে পারে।'

টমাস বললে, 'মন্দিরের মতো পুকুরপাড়ের ঘাটও বালিচাপা পড়েছে বলে মনে হয়। মন্দিরের মতো ঘাটেরও কোনো চিহ্ন কোথাও দেখছি না। অবশ্য খোঁজাখুঁজি চালিয়ে গেলে হয়তো এমন কিছুর হদিস মিলতে পারে যা দেখে মন্দির ও পুকুরপাড়ের ঘাটের আভাস পাওয়া যেতে পারে।'

চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে অরুণ বললে, 'একঘেয়ে বালির বিস্তারের মধ্যে বিশেষ কোনো ব্যতিক্রম তো দেখছি না।'

চোখে তেমন কিছু দেখা না গেলেও একটা মিষ্টি গন্ধ আমাদের নাকে এল। ধুপধুনো, ফুল ও চন্দনের একটা মিশ্র গন্ধ। ঠিক কোন দিক থেকে গন্ধটা আসছে বোঝা না গেলেও এইটুকু বোঝা গেল যে কাছাকাছি কোথাও কেউ পুজো করতে বসেছে।

'কিসের গন্ধ এটা?' টমাস উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

'পুজোর গন্ধ!' আমি জবাব দিলাম।

'পুজোর গন্ধ! বালির তলায় চাপা-পড়া মন্দিরে কি কেউ পুজো করতে বসেছে?

'না না, সে কি করে সম্ভব!' অরুণ বললে, 'বালি-চাপা মন্দিরের মধ্যে কে পুজো দেবে!'

টমাস বললে, 'ভুতুড়ে ব্যাপার...কি বল...'

এমন সময় ঢিবির আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন শ্যামাপদ। তাঁকে দেখে নীলা উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, 'এই যে বাবা এসেছেন, পুজোর গন্ধ কোত্থেকে আসছে উনিই বলতে পারবেন। বাবা এখানে কোথায় পুজো হচ্ছে বলতে পার?'

'দেবীর স্থান এটা।' শ্যামাপদ জবাব দিলেন, 'এখানকার লোকেরা এই বালুচরের পুরো এলাকাকে বলে 'ঠারাইনের থান'। এখানে যে কোনো জায়গাতেই দেবীর সান্নিধ্য পাওয়া যায়। দেবীর সান্নিধ্য এ জাতীয় ধুপ-ধুনো-ফুল-চন্দনের গন্ধের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। দেবী যে নিত্য জাগ্রত তার প্রমাণ এই গন্ধ...'

মৃদু হেসে টমাস বললে, 'ব্যাপারটা কিরকম আলৌকিক বলে বোধ হচ্ছে।'

'দেবীর স্থানে অলৌকিক বলে কিছু নেই।' শ্যামাপদ গম্ভীর মুখে বললেন, 'এখানে আপনার আমার নিয়ম খাটবে না...'

নীলা বললে, 'আচ্ছা বাবা, অষ্টভুজার মন্দিরটা পুকুরের কোন দিকে ছিল বলতে পার?'

'পুকুর!' শ্যামাপদ চমকে উঠলেন: 'কিসের পুকুর—কোন পুকুর!'

'মন্দিরের ধারের পুকুর...এই তো সেই পুকুর....এই চোরাবালি....'

অরুণ এবং টমাসের মুখের দিকে কিরকম যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন শ্যামাপদ। তারপর বললেন, 'পুকুরের হদিস তা হলে মিলল! মন্দিরও আর দূর নয়...'

এখানে কোথায় পূজো হচ্ছে বলতে পার?

'না।' অরুণ বললে, 'মন্দির নিকটে আছে বলেই আন্দাজ হচ্ছে। আপনি শুধু বলুন পুকুরের কোন দিকে ছিল মন্দিরটা....'

'সে আমি বলতে পারব না। আমার বাবার কাছ থেকে তা আমি জেনে রাখিনি।'

আমি বললাম, 'জ্যাঠামশাই বলছিলেন না যে মন্দিরের সামনেই পদ্মপুকুর, বাঁধানো স্নানের ঘাট....'

'সব চোরাবালিতে চাপা পড়েছে।' অরুণ বললে, 'দারোগাবাবু, দেখছেন তো, একদা যা পদ্মপুকুর ছিল, এখন তা চোরাবালিতে পরিণত?'

'হ্যাঁ', শ্যামাপদ জবাব দিলেন, 'এই প্রথম দেখছি। আপনারা বিশ্বাস করুন, এই চোরাবালির কথা আমার জানা ছিল না।'

নীলা বললে, 'যতীনবাবু আরও বলেছিলেন যে পুকুরের ধারে একজোড়া গোসাপ ও একটা বিশাল কাছিম থাকত।'

আমি বললাম, 'গোসাপ তো গত রাত্রেই দেখেছি আমরা।'

অরুণ বললে, 'সে হয়তো পদ্মপুকুরের গোসাপের বংশধর।'

আমি বললাম, 'সেই কাছিমটি বোধ হয় বেঁচে আছে, কারণ কাছিম দীর্ঘজীবী।'

'বেঁচে থাকলেও এই চোরাবালির মধ্যে থাকতে পারে না। হয়তো নদীর ধারে চলে গিয়েছে।'

শ্যামাপদর মুখের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে অরুণ বললে, 'ধুপ-ধুনো-ফুল-চন্দনের গন্ধ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে নিকটেই কোথাও পুজো চলছে। দারোগাঠাকুরমশাই, আপনিই বলুন এই বালুচরের মধ্যে কোথায় পুজো হচ্ছে....'

'আমি তার কি জানি!' শ্যামাপদ ঈষৎ উত্তেজিতভাবে বললেন, 'আমার নিজের পুজোআর্চা নিয়ে আমার দিন রাত কেটে যায়, আর কোথায় কে পুজো করছে তার খবর আমি কিছুই জানি না...'

অরুণ বললে, 'আমার কিন্তু মনে হচ্ছে বালির নিচে চাপা পড়া মন্দিরেই পুজো হচ্ছে....মন্দিরটা কাছেই আছে....'

'এর আমি কিছুই জানি না। বেলা অনেক হলো, এখন ঘরে ফেরা যাক....'

বলে শ্যামাপদ ঢিবি বেয়ে উঠতে থাকেন। তাঁকে অনুসরণ করে টমাস। অগত্যা আমরাও এগিয়ে যাই।

এমন সময় প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে মাটি কেঁপে ওঠে।

বিস্ফোরণ ঘটেছে ঢিবির ওপরে। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে ঢিবির চূড়া ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। টমাস ও শ্যামাপদ এগিয়ে গিয়েছিলেন, ধোঁয়ার আড়ালে তাঁরাও চাপা পড়েন। আমরা ছুটে যাই তাঁদের কাছে। অরুণ পরীক্ষা করে বিস্ফোরণের জায়গাটিকে। কি যেন কুড়িয়ে নেয় সে!

দৈহিক কোনো ক্ষতি না হলেও, মানসিক আঘাত পেয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন শ্যামাপদ ও টমাস। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তাঁরা।

খানিকক্ষণ বাদে টমাস ক্ষীণ স্বরে বলে ওঠেন, 'কাছাকাছি আমরা ছাড়া তো কেউই নেই....তবে কি...'

বলে তিনি অরুণের মুখে কটাক্ষপাত করলেন।

মৃদু হেসে অরুণ বললে, 'আমার দিকে তাকাচ্ছেন কি, আমার মতো বোমা-বিশারদ ভূ-ভারতে খুঁজে না পাওয়া গেলেও এখনকার এই অপকর্ম আমি করিনি। নীলা, তুমি তো আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছ, তুমিই বল এ আমার কীর্তি কিনা!'

'না, কখনো না।' রীতিমতো জোরালো গলায় বলে উঠল নীলা, 'অরুণদা এ কাজ করেনি।'

'তাহলে আমাদের মধ্যে আর কেউ করেছে।' বলে একে একে প্রত্যেকের দিকে তাকালেন শ্যামাপদ, আমিও বাদ গেলাম না।

টমাস বলল, 'আমাদের মধ্যে বৃথাই খুঁজে যাচ্ছেন শ্যামাপদবাবু, আমাদের মধ্যে কেউই এ কাজ করেনি—করবেই বা কেন!'

'তা অবশ্য ঠিক।' শ্যামাপদ বললেন, 'আমরা সকলেই অষ্টভুজার মন্দির এবং মূর্তির সন্ধান নিচ্ছি, আমাদের কেউ এ কাজ করতে পারে না। অতএব ধরে নিতে হয় যে স্থানীয় লোকেরা বিস্ফোরক পদার্থ প্রয়োগ করে তাদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছে। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে এখানকার লোকেরা চায় না যে আমরা বালিতে চাপা মন্দির বা মূর্তি উদ্ধার করি। মিস্টার টমাস, আমি আপনাকে আগেই বলেছি যে স্থানীয় লোকেরা দেবীকে প্রচ্ছন্নভাবে পেয়েই খুশি—তারা মনে করে প্রচ্ছন্নভাবেই দেবী জাগ্রত এবং স্থানীয় লোকেদের হিতসাধন করছেন....'

অরুণ বললে, 'স্থানীয় লোকেদের মধ্যে কেউ এ কাজ করেছে বলছেন, কিন্তু এখানকার ধারেকাছেও তো কেউ নেই, কোথাও লুকিয়ে আছে বলেও মনে হচ্ছে না। অবশ্য এমন হতে পারে যে বালির মধ্যে কেউ সময়-নিয়ন্ত্রিত বোমা মানে টাইম বম্ব পুঁতে রেখেছে।'

টমাস বললে, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে....'

অরুণ বললে, 'কিন্তু পুব বাংলার এই গ্রামাঞ্চলে এমন কে আছে যে সময়-বোমার ব্যবহার জানে! আমি হেন বোমাবিশারদ সময়-বোমা কখনো চোখেও দেখিনি।'

শ্যামাপদ বললেন, 'পুব বাংলার নগণ্য গ্রামাঞ্চল হলেও এখানে বড়লোকের অভাব নেই। জপসার পালবাবুরা তো রীতিমতো কোটিপতি। তাঁদের পক্ষে একটা সময়-বোমা সংগ্রহ করা এমন কঠিন ব্যাপার নয়। যতদূর জানি, মাটিচাপা অষ্টভুজার মূর্তি উদ্ধার করার ব্যাপারটাকে তাঁরা একটুও সমর্থন করেন না.....'

টমাস বললে, 'জনমত যখন আমাদের বিরুদ্ধে, তখন আমাদের অনুসন্ধান বন্ধ করে দেওয়াই বোধ হয় বাঞ্ছনীয়।'

টমাসের মুখের ওপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে অরুণ বললে, 'অনুসন্ধান আপনার প্রেরণা এবং প্ররোচনাতেই শুরু করা হয়েছে, সাফল্যের মুখে এসে আপনি তা বন্ধ করে দিতে চান!'

'হ্যাঁ।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে টমাস বললে, 'সকলের নিরাপত্তার কথা ভেবে আমি এই সিদ্ধান্ত নিতে চাই। এখানকার লোকেরা সত্যিই যখন চায় না......'

'কিন্তু আপনি যখন দেবীমূর্তির চোখ দুটিকে দেবীমূর্তিকে ফেরত দেবার সংকল্প করেছেন, তখন আপনার সংকল্প পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সন্ধানপর্ব চালিয়ে যেতেই হবে। মূর্তিটিকে খুঁজে বের করে চোখ দুটিকে যথাস্থানে স্থাপন করলেই আপনার কাজ শেষ হবে। আপনি সাহস না পান, এ কাজ আমিই করব.....'

'ঠিক আছে, তুমিই কর। পাথরের চোখদুটি আমি তোমাকেই দিয়ে দেব।'

শ্যামাপদ বললেন, 'অনেক বেলা হয়েছে, এখন বাড়ি ফেরা যাক।'

।। দশ ।।

শ্যামাপদর বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়া করি আমরা। নীলা মুসুর ডাল, ইলিশ মাছের ঝোল ও ভাত রান্না করে রেখে এসেছিল, তাই যত্ন করে পরিবেশন করে খাওয়াল সে আমাদের। খাওয়া শেষ করে টমাস ও শ্যামাপদ বিশ্রামের তাগিদ অনুভব করেন। টমাস চলল তার বজরায়, তাকে এগিয়ে দিতে যান শ্যামাপদ। অরুণের অনুরোধে আমি থেকে যাই তার সঙ্গে।

টমাস ও শ্যামাপদ চলে যেতেই অরুণ বললে, 'চল আমরা আবার যাই ওখানে, মানে ঐ চোরাবালির এলাকায়।'

নীলা বললে, 'আমিও যাব কিন্তু।'

'তা তো যাবেই। তুমি আমার পাহারাওয়ালা.....'

'কি যে বল তুমি!' নীলা আহত কণ্ঠে বললে, 'তোমাদের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারব না বলেই যেতে চাই। কালু ও রাজুভাইকেও নিয়ে যাব....'

কিন্তু কালু ও রাজু আমাদের বাড়ি থেকে বেরোতে দিতে চাইল না। রাজু বললে, 'আইজ আর বাইর হইবেন না। অনেক ঘুরসেন, এ্যালা ঘরের মধ্যে বইয়া থাকেন।'

অরুণ বললে, 'তুমি কি আমাদের আটকে রাখতে চাও?'

'হ।' রাজু জবাব দিল, 'কর্তার হুকুম....সাহেবও হেই কথাই কইসে....'

রাজুর মুখের ওপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে নীলা বললে, 'তুমি কি সন্তু ও আমাকেও আটকে রাখতে চাও?'

'দারোগাঠাকুর ও সাহেব তো হেইরকম কথাই কইলেন....'

'বলুনগে সেরকম কথা—আমরা তা মানব না। কারণ সন্তু ও আমি তোমাদের দারোগাঠাকুরের নজরবন্দী নই। চল সন্তু, অরুণদা না যেতে পারুন, তুমি ও আমি যাই ওখানে। অরুণদা, ঐ চোরাবালির এলাকায় গিয়ে কি করতে হবে আমাদের বলে দাও তো!'

'খুঁজতে হবে।' অরুণদা বললে, 'ঐ চোরাবালির এলাকা তো একটা পুকুর—পুকুরপাড়ের বাঁধানো ঘাটটিকে খুঁজে বের করতে হবে। কারণ ঐ ঘাটের পাশেই ছিল মন্দিরটা। ঘাটটিকে খুঁজে পেলেই বুঝবে যে নিকটেই মন্দির বালির নিচে চাপা আছে....'

চরের ওপর দিয়ে আবার হাঁটতে থাকি আমরা। বালি ও পলিমাটিতে চিহ্নিত পায়ে চলা পথ ধরে এগিয়ে যাই বালির ঢিবি বা বালিয়াড়ি লক্ষ্য করে। চড়া রোদ চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। চারপাশের নিস্তব্ধতা রোদের সঙ্গে মিশে যেন ঝাঁ ঝাঁ করছে। দুপাশে বনঝাউয়ের ঝোপ। ওখান থেকে পাখির কিচির-মিচির শোনা যাচ্ছে।

বালির ঢিবি বা বালিয়াড়ি। স্তরে স্তরে বালি জমে পাহাড়ের আকার নিয়েছে। ঢিবির ওপরে দাঁড়িয়ে চোরাবালির দিকে তাকাই। চারপাশে সুপুরি ও খেজুর গাছ দিয়ে ঘেরা সাদা থেকে হলুদ রঙের বালির মধ্যে চোরাবালিকে সনাক্ত করতে পারি এখন।

'চোরাবালি চিনতে পারছি এক নজরে।' আমি নীলার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'নীলাদি, তুমি চিনতে পারছ তো?'

'হ্যাঁ।' নীলা জবাব দিল, 'কিন্তু তবু ভয় করে।'

'ভয় কি! চোরাবালির মধ্যে পড়ে গেলেই সাঁতার কাটবে।'

'আমি যে ভাল সাঁতার জানি নে ভাই।'

'ঠিক আছে, এস, সুপারি ও খেজুর গাছগুলো ঘেঁষে চলতে থাকি। এপাশের ঢিবির মতো উঁচু পাড় না থাকলেও গাছগুলো বরাবর শক্ত জমাটবাঁধা জমির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। চল এগিয়ে যাই।'

আমরা এগিয়ে যাই। এগিয়ে যেতে যেতে ঢিবি থেকে নেমে আসি। ঢিবি থেকে নেমে এসে চোরাবালির সীমানা বরাবর খাদ দেখতে পাই। সুপারি ও খেজুর গাছ ছাড়া এই খাদ চোরাবালির সীমানা চিহ্নিত করছে। একদিকে ঢিবি ও বাকি তিন দিকে খাদ চোরবালিকে মোটামুটি চৌকো আকার দিয়েছে। ঢিবির ওপরে দাঁড়িয়ে এই খাদ চোখে পড়েনি, ঢিবি থেকে নেমে চোরাবালির সীমানা অনুসরণ করে হাঁটতে হাঁটতে খাদটাকে আবিষ্কার করি।

খাদের ওপর দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ তীক্ষ্ণ হিসহিস শব্দ শুনে থমকে দাঁড়াই আমরা দুজনে। শব্দ অনুসরণ করে দেখি যে খাদের ঠিক নিচে একটি গোখরা সাপ আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। মাঝারি আকারের সাপ। গতকাল সন্ধ্যায় টমাসের বজরা থেকে নেমে টমাস ও আমি বালুচরের মধ্যে যাকে দেখেছিলাম, এটা হয়তো সেই সাপ, রাজু হয়তো একেই মন্দিরের বাস্তুসাপ বলেছিল।

অষ্টভুজার মন্দিরের সাপ! মন্দির তাহলে নিকটেই আছে! হয়তো এই খাদে নামলেই বালিচাপা মন্দিরের প্রবেশপথের আভাস পাব!

সাপটিকে দেখামাত্র নীলা আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠলেও আমি ভয় পাই না। কারণ আমার মনে হচ্ছিল যে সাপটা ভয় পেয়েছে। যেমন ভয় গতকাল সন্ধ্যায় গোসাপকে দেখে পেয়েছিল, তেমনি ভয় পেয়েছে আমাদের দেখে। ভয় পেয়ে আত্মরক্ষার জন্য ফণা তুলেছে। বন্যপ্রাণীদের বিষয়ে বিভিন্ন শিকারীর অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে বন্যপ্রাণীদের প্রত্যেকেই মানুষকে ভয় পায়। যে গোখরো বা কেউটে সাপকে মানুষমাত্রেই ভয় পেয়ে থাকে, তার স্বভাবে যতই হিংস্রতা থাক, মানুষের ভয়ে সে তটস্থ। মানুষকে দেখামাত্র সে যে ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করে তার মধ্যে তার আক্রোশের চেয়ে ভয়ই বেশি প্রকাশ পায়। খাদের নিচে গোখরোটির ফোঁসফোঁসানির মধ্যে আমি তার ভয় ছাড়া আর কিছু দেখতে পাইনে।

গোখরোটি যে ভয় পেয়েছে একটু বাদেই তা বোঝা গেল। ফণা নামিয়ে সে

হঠাৎ দ্রুতবেগে যেতে শুরু করে। বালির ওপরে আঁকাবাঁকা রেখা টেনে জলের ধারার মতো এগিয়ে যায়। তারপর হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। মনে হলো, কোনো ফাটল বা গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়েছে সে।

আমি বললাম, 'সাপটা বোধহয় মন্দিরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। বোধহয় খাদের ঠিক নিচে কোনো ফাটল বা গহ্বর আছে, যার মধ্যে দিয়ে সে মন্দিরে পৌঁছে যেতে পারে। নিচে নেমে আমি দেখব...'

সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত দুটি নিজের দুহাত দিয়ে চেপে ধরে নীলা বললে, 'না নিচে নামা চলবে না, দেখতে হয় ওপর থেকে দেখ...'

ওপর থেকে দেখতে দেখতে বালির সঙ্গে মিশে থাকা একটা প্রকাণ্ড কচ্ছপ দেখতে পেলাম। বালির মধ্যে বালির স্তূপের মতো যেন জমাট বেঁধে আছে। বালি থেকে তাকে আলাদা করা যাচ্ছে না বলে নীলা বোধহয় তাকে দেখতে পায়নি।

একটি গোখরো ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে।

চারপাশের বালির মতো কচ্ছপটাও নিঃসাড়। আমার মনে হলো যেন সে ঘুমোচ্ছে। হয়তো এটা তার বিশ্রামের বা ঘুমের জায়গা। নগর গ্রামে কচ্ছপ চোখে পড়েনি, কিন্তু পাশের ফতেজঙ্গপুর গ্রামের পুকুরঘাটে একটি কচ্ছপকে ঘুমোতে দেখেছি। সৈয়দ আলীর কাছে শুনেছি যে কচ্ছপরা সাধারণত পুকুরপাড়ে বাঁধানো ঘাটে পড়ে থাকতে ভালোবাসে। অতএব, ধরে নেওয়া যায় যে এই কচ্ছপটাও তার পুকুরের ঘাটেই শুয়ে আছে। অষ্টভুজার মন্দিরের সামনে যে পুকুরে সে বাস করত, বন্যার পর সে পুকুর বালিতে চাপা পড়লেও সে তাকে ছাড়তে পারেনি। যেখানে সে শুয়ে আছে, সেটাই হয়তো সেই বালিচাপা পুকুরঘাট। ওখানে গিয়ে বালির মধ্যে খোঁড়াখুঁড়ি করে ঘাটটাকে উদ্ধার করা যেতে পারে।

আমি বললাম, 'নীলাদি, আমার মনে হচ্ছে, অষ্টভুজার মন্দিরের ঘাটটিকে খুঁজে পেয়েছি।'

'খুঁজে পেয়েছ!' নীলা উত্তেজিত স্বরে বললে, 'কোথায়?'

'ঐ তো আমাদের সামনেই রয়েছে—ঐ যেখানে কচ্ছপটা শুয়ে আছে....'

'কচ্ছপ!' নীলা আঁতকে উঠল।

'হ্যাঁ। ঐ যে বালির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। জ্যাঠামশাই বোধহয় এর কথাই বলেছিলেন। অষ্টভুজার মন্দিরের ঘাটে জ্যাঠামশাই যখন তাকে দেখেছিলেন, তার অনেক আগে থেকেই সে বোধহয় আছে এখানে। কচ্ছপের পরমায়ু চার থেকে পাঁচশো বছর পর্যন্ত হয় বলে শুনেছি।'

ঐ চোরাবালির কাছে গিয়েছিলে বুঝি?

'এইটে সেই কচ্ছপ!' নীলার চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, 'দেখে তোমার ভয় করছে না!'

'ভয় করবে কেন! কচ্ছপ তো নিরীহ জীব....'

'আমার কিন্তু অস্বস্তি লাগছে ওকে দেখে....'

নীলার অস্বস্তি দ্বিগুণতর হলো যখন কচ্ছপটি তার বালুকাশয্যা থেকে উঠে চলতে শুরু করে। দেখে মনে হয় যেন বালুর স্তূপ নড়াচড়া করছে। নিঃশব্দে এগিয়ে যায় সে। তারপর অদৃশ্য হয়ে যায় বালুর স্তূপের মধ্যে।

ঠিক এমনি সময় আমাদের পায়ের নিচের বালি যেন কথা বলে ওঠে। মনে হলো যেন বালির সঙ্গে মিশে থেকে কারা যেন গল্প জুড়ে দিয়েছে।

'শুনছ সন্তু!' নীলা কম্পিত স্বরে বলে ওঠে, 'কেউ কোথাও নেই, কিন্তু কথাবার্তা চলছে! এ যেন ভুতুড়ে ব্যাপার...'

'ভুতুড়ে ব্যাপার বলে কিছু নেই।' চাপা দৃঢ় স্বরে আমি বললাম, 'কাছাকাছি কারা রয়েছে ও কথা বলে যাচ্ছে।'

'কোথায় রয়েছে? কেউ তো কোথাও নেই!'

'চোখের সামনে না থাকলেও চোখের আড়ালে আছে। আমি তাদের গায়ের গন্ধ পাচ্ছি....'

'গায়ের গন্ধ কিগো!' নীলার চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, 'আমি ফুল-চন্দনের গন্ধ পাচ্ছি! বাবা যখন কপালে চন্দন মেখে টিকিতে ফুল বাঁধেন, তখন তার গা থেকে এই গন্ধ পাই....'

'তার মানে তোমার বাবার গায়ের গন্ধ!'

'না না, বাবার গায়ের গন্ধ কেন হবে? বাবা কোথায় যে তাঁর গায়ের গন্ধ পাব!'

'তোমার বাবা না থাকলেও আর কেউ আছে। একজন নয়, দুজন.....কাছেই আছে....'

'আমার ভীষণ ভয় করছে সন্তু!' নীলা আমার হাত দুটি নিজের দুহাতে চেপে ধরে বললে, 'চল, পালিয়ে যাই এখান থেকে....'

বলে সে দৌড়তে শুরু করে। অনেক কষ্টে আমি তাকে অনুসরণ করি।

হাঁপাতে হাঁপাতে আমরা দু'জনে অরুণের ঘরে এসে ঢুকলাম। আমাদের দিকে তাকিয়ে অরুণ উদ্বিগ্ন স্বরে বললে, 'কি হয়েছে তোমাদের? কেউ তাড়া করেছে নাকি?'

'কে আবার তাড়া করবে!' আমি জবাব দিলাম, 'নীলাদি ভয় পেয়েছে।'

'ভয় পেয়েছে! কিসের ভয়?'

সব কথা অরুণকে বলতে তার মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে বললে, 'মনে হচ্ছে তোমরা অষ্টভুজার মন্দিরের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলে। আর একটু চেষ্টা করলেই মন্দিরের মধ্যে ঢোকার পথ খুঁজে পেতে। তবে তোমরা খুঁজে না পেলেও আর কেউ খুঁজে পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে। বোধহয় তাদের গলার স্বরই তোমরা শুনতে পেয়েছিলে!'

নীলা ভুরু কুঁচকে অরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'যাদের গলার স্বর শুনেছি তারা কি মানুষ!'

'অমানুষ।' মৃদুমন্দ হাসতে থাকে অরুণ, 'কোনো কুমতলব নিয়ে হয়তো মন্দিরের মধ্যে ঢুকেছিল।'

এমন সময় ঘরে ঢুকলেন শ্যামাপদ। তাঁকে দেখে মনে হলো যেন সদ্য স্নান সেরে এসেছেন। স্নান করলেও অবশ্য তাঁর কপাল থেকে চন্দনের দাগ মুছে যায়নি, টিকি থেকে ফুলটাও পড়েনি খসে।

ঘরে ঢুকে নীলা ও আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'তোমরা আবার ঐ চোরাবালির কাছে গিয়েছিলে বুঝি?'

'হ্যাঁ।' নীলা জবাব দিল।

'খুব অন্যায় করেছ। আর ওদিকে যাবে না।'

তারপর অরুণের দিকে তাকিয়ে শ্যামাপদ রীতিমতো কঠোর স্বরে বললেন, 'আজ থেকে তোমারও বাড়ি থেকে বেরোনো বন্ধ। টমাস সাহেবের বজরায় করে কাল সকালে আমি মাদারিপুর যাচ্ছি, সেখানে ডি এস পি সাহেবকে বলে আমি এখান থেকে অন্যত্র তোমাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব।'

'কেন দারোগাঠাকুর?' অরুণ শান্তভাবে প্রশ্ন করে, 'আমার অপরাধ কি?'

'তোমার অপরাধ তুমি টমাস সাহেবের প্ররোচনায় বালিচাপা মন্দির উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছ। এ ব্যাপার থেকে টমাস নিজেকে সরিয়ে আনলেও তুমি নিরস্ত হচ্ছো না....অতএব.....'

কথাটা সম্পূর্ণ না করেই শ্যামাপদ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর হাবভাবে বোঝা গেল যে চাপা উত্তেজনায় তিনি অস্থির হয়ে উঠেছেন।

শ্যামাপদ বেরিয়ে যেতেই আমি বলি, 'নীলাদি, সেই গন্ধ....'

নীলা চমকে উঠে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে আমার ও অরুণের মুখের দিকে।

।। এগার ।।

'কিসের গন্ধ?' অরুণ প্রশ্ন করল।

'ফুল চন্দনের।' আমি জবাব দিলাম, 'ঠাকুরমশাই যে ফুল-চন্দন ব্যবহার করেন, তার গন্ধ।'

'তিনি ঘরে ঢুকতেই সে গন্ধ পেয়েছ তো! তা তো পাবেই।'

'এই গন্ধ একটু আগে নীলাদি ও আমি চোরাবালির ধারে পেয়েছি, যাদের অস্পষ্ট স্বর আমাদের কানে এসেছিল, তাদের গা থেকে বোধহয় এই গন্ধ বেরিয়ে আসছিল।'

'সকালেও তো ঐ চোরাবালির ধারে এই গন্ধ আমরা পেয়েছিলাম—তাই না নীলা?' অরুণ প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ', নীলা জবাব দিল।

'বাবা ঢিবির আড়াল থেকে বেরিয়ে আসার আগেই গন্ধটা আমাদের নাকে এসেছিল। বাবা বলেছিলেন যে, দেবী যে নিত্য জাগ্রত তার প্রমাণ এ গন্ধ।'

'কিন্তু সে গন্ধ এ ঘরে এল কি করে?' আমি প্রশ্ন করি।

'চমৎকার প্রশ্ন। কিন্তু তার উত্তরটা তেমন চমৎকার না-ও হতে পারে। এখনই তার বিষয়ে কিছু বলতে পারব বলে অবশ্য মনে হচ্ছে না। রাত হোক... তারপর...'

'রাত হলে কি হবে অরুণদা!' আমি বললাম, 'ঠাকুরমশাই তো আপনাকে ঘর থেকে বেরোতেই দেবেন না...'

'সেই তো হয়েছে মুশকিল!' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল অরুণ।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। নীলা আমাদের দুজনকে চিঁড়ে-দই ও সবরি কলা (মর্তমান কলা) খেতে দিল। খেতে খেতে আবার সেই গন্ধ পাই। পুজোর গন্ধ—মন মাতানো চন্দনের গন্ধ। সঙ্গে সঙ্গে শাঁখের আওয়াজও কানে এল। ঠাকুরমশাই বোধ হয় পুজোয় বসেছেন।

একটু বাদে ঘরে এল নীলা। বললে, 'পুজোর সময় হয়ে গেল, এখনো বাবা ঘরে ফিরলেন না!'

'কিন্তু এইমাত্র পুজোর গন্ধ পেলাম যে!' আমি বললাম, 'শাঁখের আওয়াজও হলো....'

'ফুল তুলে চন্দন বেটে রোজকার মতো আজও পুজোর যোগাড় করে রেখেছি, তা ছাড়া ধুনো দিয়ে শাঁখও বাজিয়েছি...'

'এ সব তা হলে তোমারই কীর্তি! কিন্তু ঠাকুরমশাই গেলেন কোথায়?'

'তা তো জানি না!' নীলা ব্যাকুল স্বরে বললে, 'পুজোর সময় পেরিয়ে গেল, অথচ বাবা বাড়িতে নেই, এমন হয়নি কখনো। সন্ধ্যার আগে কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়েছেন, রাজু ভাই ও কালু ভাইও জানে না কোথায় গিয়েছেন তিনি।'

'খুবই চিন্তার বিষয়।' অরুণ গম্ভীর মুখে বললে, 'আর দেরি না করে ওর সন্ধান নেওয়া উচিত। কালু মিঞা ও রাজু মণ্ডলকে বল খোঁজ নিতে।'

তৎক্ষণাৎ দুজনকেই ডেকে পাঠাল নীলা। কিন্তু দুজনের একজনও পাহারা ছেড়ে শ্যামাপদকে খুঁজতে বেরোতে রাজী হলো না। রাজু বললে, 'পাহারা ছাইড়্যা বাইর অইলে কত্তা গুসা অইব।'

'ঝাঁটা মারি তোমাদের পাহারার মাথায়।' নীলা ঝাঁঝালো স্বরে বলে উঠল, 'আমার হুকুম এখনই বেরিয়ে পড় তোমরা বাবাকে খুঁজতে। নইলে অরুণদাকে নিয়ে আমিই বেরবো।'

'না না দিদিমণি!' আর্তস্বরে বলে উঠল রাজু মণ্ডল, 'তোমরা বাইর অইও না, আমি যাইতাসি।'

তারপর কালুর দিকে তাকিয়ে রাজু বললে, 'কাউল্যা রে, তুই পাহারা দে, আমি দেহি কর্তা কই গ্যাল...'

অরুণ বললে, 'প্রথমে টমাস সাহেবের বজরায় যাও রাজু ভাই। তোমাদের কর্তাকে হয়তো সেখানেই পেয়ে যাবে।'

রাজু বললে, 'ঠিক কইসেন বোমাবাবু, সাহেবের থানেই ঠাকুরকর্তারে পাইয়া যামু।'

'দেখছ তো রাজু ভাই, লালমুখো সাহেব কিরকম তোমাদের দারোগা ঠাকুরের পুজো ঘুচিয়ে দিয়েছেন! সাহেব তোমাদের মায়েরও বাড়া—কি বল রাজু ভাই?'

উত্তরে রাজু কিছু বলার আগে কালু ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললে, 'না না বোমাবাবু, এই কথা মুহেও (মুখে) আনবেন না। আমাগো ঠারাইন হগলের উপরে—ঠারাইন যদি ইচ্ছা করেন, ঐ লালমুখ বান্দরটার ধর থেইক্যা মুণ্ডু খইস্যা পড়ব...'

'চুপ চুপ কাউল্যা।' রাজু শিউরে উঠলঃ 'এই সব কথা মুহেও আনিস না। ইংরাজ সরকারের নিমক খাস, সাহেবগো নিন্দামন্দ করবি না। তুই ঠাণ্ডা অইয়া বয় (বোস্) এইখানে, আমি সাহেবের বজরার থন লর্ দিয়া (তাড়াতাড়ি) ঘুইর‍্যা আহি...'

বলে বেরিয়ে পড়ল রাজু।

কিন্তু ফিরে এল সে অল্পক্ষণের মধ্যেই। এত তাড়াতাড়ি সে বজরা থেকে যে ঘুরে এল কি করে ভেবে পেলাম না।

তার কাঁধে একটা থলি। থলিটা আমার—তার মধ্যে আমার জামাকাপড় রয়েছে। রাজুর কাঁধে আমার জামাকাপড় ভর্তি থলিটাই প্রমাণ করছে যে রাজু টমাসের বজরায় গিয়েছিল, কারণ থলিটা ওখানেই ছিল।

আমি বললাম, 'টমাস সাহেবের বজরা থেকে আমার জামা কাপড়ের থলিটা নিয়ে চলে এলে, অথচ তোমাদের দারোগা ঠাকুরের খবর নিলে না...'

'খবর কিছু নাই খোকাবাবু।' রাজু ম্লান মুখে বললে, 'সাহেবের বজরায় তো যাই নাই, এইখান থেইক্যা একটু আউগাইয়া যাইতেই তো সাহেবের বজরায় মাঝির লগে মোলাকাত অইল। হ্যাডায় (সে) খোকাবাবুর থলিখান লইয়া এই দিকেই আইথাসিল, আমার লগে (সঙ্গে) মোলাকাত অইতেই থলিখান আমারে দিয়া কইল রাত্রের নমাজ সাইরাই (সেরে) সে ছাইরা (ছেড়ে) দিব সাহেবের বজরা। তার কাছে খবর পাইলাম যে বজরায় সাহেব ছাড়া আর কেউ নাই। বজরা ছাইরা দিব, বইল্যা খোকাবাবুর থলিখান ফিরৎ দিতে আইথাসিল।'

'বজরা ছেড়ে দেবে মানে!' ঝলসে উঠল অরুণের চোখ দুটি। 'অষ্টভুজার চোখ দুটি রেখে যাবে বলেছিল, তার কি হবে! তোমাদের দারোগা ঠাকুর নিখোঁজ হয়েছেন, অথচ সাহেব তাঁর বজরা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন!'

এখনই বেরিয়ে পড় বাবাকে খুঁজতে।

রাজু বললে, 'পলাইয়া তো যাইতেসেন না, চইল্যা যাইতেসেন। বজরা লইয়া আইসিলেন, এ্যালায় বজরা লইয়া ফিরৎ যাইবেন মাদারিপুর।'

'ফেরত যাওয়ার আগে সঙ্কুকে ওর নগর গ্রামে পৌঁছে দেওয়া উচিত ছিল। তা না করে ওর থলিটা তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন এখানে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, টমাস সাহেবের এখান থেকে চলে যাওয়ার তাড়া আছে। কাজেই পালিয়েই যাচ্ছেন তিনি। তোমাদের কর্তা নিখোঁজ, অথচ সাহেব পালাচ্ছেন। এ হেন অবস্থায় বল আমাদের কি করা উচিত। আমি জানি, রাজু কোনো জবাব দেবে না। কালু মিঞা, তুমি বল, এখন আমাদের কি করা উচিত...'

'বজরা আটক করন উচিত।' কালু উত্তেজিত স্বরে বললে, 'রাতের আন্ধারে গা ঢাকা দিয়া হালায় পলাইয়া যাইব, এ আমি হইতেই দিমু না। রাউজ্যাদা কিছু করুক বা না করুক, আমি গিয়া আটক করুম ঐ বজরা।'

অরুণ বললে, 'একা একা পারবে তুমি বজরাটা আটকাতে?'

'একলা ক্যান, চরের হ্যাখের (শেখ) পোগো ডাইক্যা নিয়া আসুম, হগলে মিল্যা ঘিরা ফালামু ঐ বজরা ও বজ্জাতটারে...'

'ঠিক আছে তাই কর তাড়াতাড়ি।' অরুণ ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললে, 'যে করে হোক বজরাটাকে আটকাও...'

'হ, অহনই যাইতাসি।' বলে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কালু।

রাজু বললে, 'এইটা কি করলেন বোমাবাবু! কাউল্যারে তার ডিউটির থনে আকামের মধ্যে ঠেইল্যা দিলেন!'

'আকাম কাকে বলছ! তোমাদের কর্তা কিরকম বিপদের মধ্যে পড়তে চলেছেন তা কি চিন্তা করে দেখেছ!'

'চিন্তা আমি করুম ক্যান, আমি করুম কর্তার ইচ্ছায় কর্ম!'

নীলা ব্যাকুল স্বরে বললে, 'বাবা খুব বিপদে পড়েছেন বুঝি?'

'পরিস্থিতি বিপজ্জনক।' অরুণ জবাব দিল, 'এর মধ্যে বিপদ ঘটতেও পারে। আশা করি তিনি তাড়াতাড়ি ফিরে এসে সম্ভবপর বিপদ-আপদ সব এড়াতে পারেন...'

কিন্তু শ্যামাপদ ফিরে এলেন না। বিকেল থেকে আকাশে ছেঁড়া মেঘের আনাগোনা চলছিল, এখন সেগুলো জমাট বেঁধে আকাশ ছেয়ে ফেলে। মেঘের গতির সঙ্গে তাল রেখে বাতাস বইছিল, মেঘ যত জমাট বাঁধে বাতাসের গতি তত বেড়ে যায়। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হতেই ঝড় শুরু হয়।

'এই ঝড়ের মধ্যে বাবা ফিরবেন কি করে অরুণদা।' নীলা কাতর স্বরে বললে।

'ঝড়ের আগেই ফেরা উচিত ছিল। তা যখন ফেরেননি, তার সন্ধানে আমাদের বেরিয়ে পড়া উচিত। নীলা, কোনরকম বাধা আমি মানব না...'

'কেউ তোমাকে বাধা দেবে না। তোমার সঙ্গে আমরাও যাব...'

'বাধা আমি দিমু।' রাজু বললে, 'আমরা ডিউটির থনে কেউ আমারে এক চুল এইদিক ঐদিক করতে পারবা না।'

'তোমার ডিউটি এখন বাবাকে খুঁজে বের করা।' নীলা চাপা গম্ভীর গলায় বললে, 'বাবার কিছু হলে তুমিই দায়ী হবে, তোমাকেই জবাবদিহি করতে হবে...'

'এইটা কি কও দিদিমণি! কর্তা নিজের মনে যেইখানে খুশি ঘুইর‍্যা বেড়াইবেন, আর ত্যানার কিছু অইলে আমি দায়ী হমু!'

'নিশ্চয়ই। তুমি পাহারাওয়ালা, শুধু তোমাদের বোমাবাবু নয়, আমাদের সকলের দিকেই তোমার নজর রাখা উচিত। এই ঝড়ের রাতে বাবা হয়তো কোনো বিপদে পড়েছেন...তুমি যাও রাজু রাইফেলটা আমার লগেই ভাই...' 'হ যাই।' বলে মাথা চুলকোতে চুলকোতে রাজু বললে, 'বোমাবাবুও যাইবেন কইথাসিলেন। আমার লগে (সঙ্গে) তেনি আইতে পারেন...'

রাইফেলটা আমার লগেই থাকে সব সময়ে

'হ্যাঁ চল।' অরুণ বললে, 'আমার থলির মধ্যে টর্চলাইট, মোমবাতি, দেশলাই ইত্যাদি নিয়ে নিচ্ছি। রাজু ভাই, তুমি তোমার রাইফেলটা নিতে ভুলো না।'

'না ভুলুম না। রাইফেলটা আমার লগেই থাকে সব-সময়, যেইখানে যাই, রাইফেলটা নিয়াই যাই...'

'খুব ভাল। এখন চল...'

নীলা বললে, 'আমরাও যাব, আমরা মানে আমি ও সন্তু।'

বাইরে এসে জমাট বাঁধা অন্ধকারের সঙ্গে ঝড়ের মুখোমুখি হই আমরা। ঝড়ের সঙ্গে আমাদের মুখের ওপরে বালির ঝাপটা এসে লাগে, সোজা হয়ে দাঁড়াতেও কষ্ট হয়।

'এই তুফানের মইধ্যে কি মাইনসে বাইর অইতে পারে!' রাজু আর্তস্বরে বলে উঠে, 'ঝর-তুফান থামলে পর বাইর অইলে অইত না!'

'না।' অরুণ বললে, 'আর একটুও দেরি করা যাবে না...চল, পা চালিয়ে চল...'

'কোন দিকে যামু?'

'চোরাবালির দিকে, দারোগা ঠাকুর ঐখানেই পুজো দিতে গিয়েছেন মনে হচ্ছে।

বালিচাপা মন্দিরের সন্ধান তাঁর জানা ছিল। তাই তো নীলা ও সঙ্কু বালিচাপা পুকুরঘাটের ওপরে দাঁড়িয়ে পুজোর গন্ধ পেয়েছে, মাটির নিচে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনেছে। একই গন্ধ আমরা ঢিবির কাছে চোরাবালির ধারে দাঁড়িয়ে পেয়েছি, বিকেলে দারোগা ঠাকুর আমার ঘরে ঢুকতে আমাদের নাকে এসেছে। এই গন্ধ দারোগা ঠাকুরের গায়ের গন্ধ ছাড়া আর কিছু নয়। চল ঐ গন্ধ অনুসরণ করে আমরা বালি চাপা মন্দিরের প্রবেশ পথ খুঁজে বের করি...'

॥ বার ॥

ঝড়ের রাতে আমাদের অভিযান রাজুর কাছে রীতিমত দুঃসাহসিক বলে মনে হলো। নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে চলতে চলতে সে বললে, 'আমাগো হগ্গলের সর্বনাশ করনের তালে আছেন বোমাবাবু। দারোগা ঠাকুরকে যেমন আমরা খুইজ্যা পাইতাসি না, আমাগোও আর কেউ খুইজ্যা পাইবে না...'

'কি সব যা তা বলছ তুমি রাজু ভাই!' নীলা ধমকের সুরে বলে ওঠে, 'আর একটাও কথা না বলে অরুণদা যা বলছে তা করে যাও...'

কিন্তু অরুণ যা বলছে তা করা যে কত কঠিন তা আমরা পদে পদে টের পাই। পায়ের তলার বালি ঝড়ে উড়ে বাতাসকে আচ্ছন্ন করেছে, হাঁটা মানে বালির সঙ্গে লড়াই। বালির সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে আমরা চোরাবালির দিকে এগিয়ে যাই। বালিয়াড়ি বা বালির ঢিবিও বালির ঝড় ও অন্ধকারে চাপা পড়েছে। তাকে কি করে পেরিয়ে গেলাম তা এখন ভেবে পাই না। আবেগের ঝোঁকেই বোধহয় অসাধ্য সাধন করেছিলাম আমরা সেদিন রাত্রে। শ্যামাচরণ সম্বন্ধে উদ্বেগের তাড়নায় আমরা ঐ ঢিবি পেরিয়ে চোরাবালির ধারে এসে দাঁড়াই। বালির ঢিবির মতো চোরাবালির চারপাশের সুপারি ও খেজুর গাছগুলোও আঁধারে চাপা পড়েছে, চোরাবালিকে চিনতে পারি আমরা তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসা আলো দেখে। আলো বললে ঠিক বলা হবে না, তাকে স্নিগ্ধ আগুনই বলা উচিত। বালির দানাগুলো যেন জ্বলছে। বালির সঙ্গে মিশে থাকা ফরফরাসই এই আগুনের উৎস। ফসফরাসের উৎস হলো মাছ, শামুক, ঝিনুক প্রভৃতির দেহাবশেষ। তা নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি।

বালিজোড়া ফসফরাসের ঠান্ডা আগুন অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে চোরাবালিকে উদ্ভাসিত করেছে। তাই অন্ধকারের মধ্যে সবকিছু চাপা থাকলেও চোরাবালি স্বয়ং প্রকাশ হয়ে আছে।

অরুণ বললে, 'পুকুরের ধারে তো পৌঁছে গিয়েছি, এবারে তোমরা দুজনে আমাদের ঘাটের কাছে নিয়ে চল।'

নীলা বললে, 'এই অন্ধকারে ঘাটের ঠাহর হবে কি করে অরুণদা! কচ্ছপটা তো আর বসে নেই...'

'গন্ধ দিয়ে হতে পারে।' অরুণ বললে, 'ধূপ-ধুনো চন্দনের গন্ধ, দারোগা ঠাকুরের গায়ের গন্ধ। গন্ধ অনুসরণ করে আমরা ঘাটের কাছে পৌঁছে যেতে পারি, কারণ মন্দির ঘাটের কাছে।'

আমি বললাম, 'গন্ধ অনুসরণ করে পুষ্করিণীর ঘাট কেন, মন্দিরেই পৌঁছে যাব।'

নীলা বললে, 'বালিচাপা মন্দিরের মধ্যে যে পুজো দেওয়া হয়, তা তুমি জানলে কি করে অরুণদা?'

'গন্ধ থেকে।' অরুণ জবাব দিল, 'এ সম্বন্ধে তো আগেই বুঝিয়ে দিয়েছি তোমাদের।'

'তুমি বলতে চাও যে বাবা ঐ মন্দিরটার সন্ধান পেয়েছেন এবং রোজ মন্দিরে ঢুকে পুজো দিচ্ছেন?'

ওঁকে বের করে আন ভেতর থেকে।

'হ্যাঁ। আজ দুপুরে যে তিনি মন্দিরের মধ্যে ঢুকে পুজো দিচ্ছিলেন তার প্রমাণ তো তোমরা দুজনে পেয়েছ!'

'গন্ধটাই প্রমাণ বলতে চাও?'

'গন্ধটা যে তোমার বাবার, তা স্বীকার করছ তো?'

'বাবা যে চন্দন ও ধূপ-ধুনো ব্যবহার করেন তার গন্ধ।'

'তোমার বাবা তো সর্বদাই ঐ চন্দনের তিলক পরে থাকেন, অতএব ঐ গন্ধ তোমার বাবার গন্ধ।'

এরপর নীলা আর কোনো কথা বলে না।

অরুণ বললে, 'চল ঐ গন্ধ অনুসরণ করি আমরা।'

কিন্তু ঐ গন্ধের কোনো হদিস পাই না আমরা। ঝোড়ো হাওয়ার একটা মেঠো গন্ধ নাকে এলেও চন্দন, ধূপ-ধুনো বা ফুলের কোনো গন্ধই পাই না।

গন্ধের অন্বেষণে আমাদের তিনজনই যখন হতাশ হতে চলেছি, তখন চাপা গোঙানির মতো একটা কান্নার স্বর আমাদের কানে এল, ঝড়ের শব্দকে তা ছাপিয়ে ওঠে।

কে কাঁদে এই চোরাবালির মধ্যে?

আমরা তিনজনই চমকে উঠি।

'কান্না শুনতে পাচ্ছ তো অরুণদা?' ভয়ার্ত স্বরে প্রশ্ন করে নীলা, 'কে কাঁদে এই বালুচরের মধ্যে?'

নীলার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অরুণ, কান্নাকে অনুসরণ করে অন্ধকারের মধ্যে কি যেন খোঁজে সে।

'কি হলো অরুণদা—চুপ করে আছ কেন, জবাব দাও আমার প্রশ্নের।'

'তোমার প্রশ্নের জবাব তো আমি জানি না।' অরুণ বললে, 'এ কান্না আগেও আমি শুনেছিলাম। সেদিন এই কান্নার কথা আমি সঙ্কুর জ্যাঠামশাইকে বলতে গিয়ে এই কান্নাকে মাটির কান্না বলে বর্ণনা করেছিলাম। সঙ্কুর জ্যাঠামশাই বলেছিলেন যে এরও একটা মূল্য আছে এবং আমাকে এই কান্নার রহস্যভেদ করতে বলেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে এই কান্নাকে ভৌতিক বা অলৌকিক ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না।'

নীলা বললে, 'মাটি কাঁদছে, বালি কাঁদছে, এ তো ভুতুড়ে ব্যাপারই অরুণদা...'

'না। চল, এই কান্না অনুসরণ করে আমরা এগিয়ে যাই...যেতে যেতে কান্নার উৎসের কাছে পৌঁছে যাব...'

'না না!' নীলা শিউরে ওঠে।

নীলার ভয় অরুণকে একটুও বিচলিত করে না। সে এগিয়ে যায় কান্নাকে অনুসরণ করে। সে এগিয়ে যাচ্ছে বলে আমরাও এগিয়ে যাই, কারণ তাকে বাদ দিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস আমাদের একজনেরও নেই।

অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যাচ্ছি বুঝতে পারি না। কান্না লক্ষ্য করে যাচ্ছি—ক্রমশ যেন কান্নার কাছাকাছি হচ্ছি।

কান্নার শব্দ যেদিক থেকে আসছে সেদিকে তাকিয়ে অন্ধকারের মধ্যে একটি আলোর বৃত্ত দেখতে পাই। আলোটা যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে। অর্থাৎ মাটির মধ্যে একটা গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসছে এই আলো। স্পষ্টত ওটা একটা সুড়ঙ্গের মুখ।

তবে কি ঐ সুড়ঙ্গের মধ্যে থেকে কান্নার শব্দ বেরিয়ে আসছে—ঐ সুড়ঙ্গের মধ্যে কেউ গুমরে গুমরে কাঁদছে!

সুড়ঙ্গের মধ্যে কেউ আছে কি না বুঝতে হলে সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকতে হবে।

অরুণ এগিয়ে যায়। অরুণ এগিয়ে যাচ্ছে বলে আমরাও এগিয়ে যাই। এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে অরুণ বললে, 'এইবার বুঝতে পেরেছি...'

'কি বুঝতে পেরেছ অরুণদা ?' উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করে নীলা।

'কে কাঁদছে তা বুঝতে পেরেছি।'

'কে অরুণদা ?' নীলার গলার স্বর কাঁপে।

'কেউ নয়...মানে কোনো মানুষ নয়...'

'কোনো মানুষ নয়! বল কি!' নীলা শিউরে ওঠে।

'ঝোড়ো হাওয়া ঐ গহ্বরের মধ্যে কান্নার শব্দ সৃষ্টি করেছে।' অরুণ শান্তভাবে বললে, 'তবে এই শব্দের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকলেও সুড়ঙ্গের মধ্যে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে। বোধহয় মাটি-চাপা মন্দির ঐ সুড়ঙ্গের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন। অষ্টভুজার মূর্তি হয়তো ওর মধ্যেই আছে...'

'পুজোর গন্ধ পাচ্ছি অরুণদা।' নীলা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'ভেতরে কেউ যেন পুজোয় বসেছেন।'

'ঠিক বলেছ। সুড়ঙ্গের মধ্যে যিনি আছেন, তিনিই পুজোয় বসেছেন। গন্ধটা লক্ষ্য করেছ তো ? তোমার বাবা যে ধুনো, ধূপকাঠি, চন্দন ইত্যাদি ব্যবহার করেন, তাই ব্যবহার করা হচ্ছে, অতএব তোমাদের কি মনে হয় না যে তোমার বাবাই ওখানে পুজোয় বসেছেন ?'

'ঠিক তাই!' রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল নীলা, 'বাবার গায়ের গন্ধ, যে গন্ধ বাবা ঘরে ঢুকলেই পাই...বাবা পুজোয় বসেছেন...বাবা, বাবা...'

বলে চিৎকার করে ডাকতে থাকে নীলা।

নীলার ডাকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ঘটে একটা প্রচন্ড বিস্ফোরণ। সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের মাটি কাঁপে, মাটি ফুঁড়ে বালি ওঠে। একই সঙ্গে সুড়ঙ্গের মুখটি ধস নেমে বন্ধ হয়ে যায় এবং থেমে যায় কান্নার শব্দ। সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ হতেই পুজোর গন্ধও মিলিয়ে যায়। অরুণ ছুটে গিয়ে বিস্ফোরণের জায়গাটি পরীক্ষা করে। মাটি থেকে কি যেন তুলেও নেয়।

'বাবা ধসে চাপা পড়েছেন।' চিৎকার করে ওঠে নীলা, 'দোহাই অরুণদা, ওঁকে বের করে আন ভেতর থেকে।'

'অসম্ভব।' গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল অরুণ, 'ধস সুড়ঙ্গকে বন্ধ করে দিয়েছে, অর্থাৎ ধস নামার ফলে সুড়ঙ্গের কোনো অস্তিত্বই আর নেই। তোমার বাবার নাগাল পেতে হলে নতুন করে সুড়ঙ্গ খুঁড়তে হবে...'

'তার মানে বাবাকে আর ফিরে পাব না!' আর্তকণ্ঠে কেঁদে উঠে মূর্ছিত হয়ে পড়ল নীলা।

ধস নামতেই ঝড় থামে। চারদিক পুরোপুরি শান্ত ও স্তব্ধ হয়ে যায়।

বিপর্যয়ের কোনো চিহ্ন কোথাও অবশিষ্ট থাকে না। মূর্ছিত নীলাকে আমরা তিনজনে মিলে বয়ে নিয়ে চলি বাড়ির দিকে। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত হলেও আকাশের তারা ও স্বয়ংপ্রভ চোরাবালির আলো আমাদের পথ দেখায়।

।। তের ।।

নীলার ঘরে নীলাকে তার বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলো। রাজু তার এবং কালু মিঞার স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে এসে নীলার পরিচর্যার ব্যবস্থা করে। তারপর অরুণ বললে, 'নীলার সুস্থ এবং স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে, ইতিমধ্যে চল আমরা বজরায় গিয়ে টমাসের সঙ্গে আলাপ করি। আজ দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর টমাসকে এগিয়ে দিতে গিয়ে শ্যামাপদবাবু মন্দিরে গিয়ে ঢুকেছিলেন। সন্ধ্যাবেলায় তাঁর নিয়মিত পূজা-সন্ধ্যা না করে আবার গিয়ে ঢুকেছিলেন ওখানে। বিস্ফোরণের আগে পর্যন্ত তিনি যে ওখানে ছিলেন তার আভাস আমরা পেয়েছি। টমাসের কাছ থেকে জেনে নেব বারবার সে ওখানে যাচ্ছিল কেন! সঙ্কু, নীলা ও তুমি তো মাটির নিচে দুজনের মধ্যে কথোপকথন শুনেছিলে...আমার মনে হচ্ছে শ্যামাপদবাবু টমাসকে নিয়ে ওখানে ঢুকেছিলেন এবং কথাবার্তা বলছিলেন...'

আমি বললাম, 'কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরমশাই তো একাই ঢুকেছিলেন ওখানে—তাই না?'

'হ্যাঁ। তবে ওখানে যাওয়ার আগে তাঁর সঙ্গে টমাসের আলাপ হওয়ার সম্ভাবনা, কারণ টমাসের বজরাতে করে টমাসের সঙ্গে তিনি মাদারীপুর যাবার কথা ভেবেছিলেন। টমাসের সঙ্গে আলাপ করলে এসব বোঝা যাবে। এ ছাড়া বালির মধ্যে সময়-বোমা ঢুকিয়ে দু-দু'বার যে বিস্ফোরণ ঘটানো হলো সে সম্পর্কেও টমাসের সঙ্গে আলাপ করা দরকার। দ্বিতীয় বিস্ফোরণের ফলে মন্দিরটা বিধ্বস্ত হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে এবং শ্যামাপদবাবুও সম্ভবত প্রাণ হারিয়েছেন, এর থেকে বোঝা যায় যে বিস্ফোরণ স্থানীয় লোকদের মধ্যে কেউ ঘটায়নি। কারণ স্থানীয় লোকেরা অনুসন্ধানকারীদের ভয় দেখাতে চাইলেও মন্দিরকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাইবে না। কাজেই এ-জাতীয় বোমা, এখানকার কেউ তৈরি করেছে বলে মনে হয় না।'

'বোমাটা বোধহয় টমাস নিয়ে এসেছেন।' আমি বললাম।

'আমারও তাই ধারণা। প্রথমবার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তিনি আমাদের ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন মন্দিরটিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য। দ্বিতীয় বিস্ফোরণের আগেই অবশ্য তিনি পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন এখান থেকে।'

আমি বললাম, 'যে অষ্টভুজার মূর্তি ও মন্দির খুঁজে বের করার জন্য আমরা উঠে পড়ে লেগেছি, শ্যামাপদবাবু তাদের খোঁজ আগেই পেয়েছিলেন। জানতেন কোথায় আছে, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারেননি আমাদের কাছে!'

অরুণ বললে, 'আমাদের কাছে বলতে না পারলেও টমাসকে বলেছিলেন। আচ্ছা সঙ্কু, টমাসের সঙ্গে দারোগাঠাকুরের কি আগেভাগে কোনো যোগাযোগ ঘটেছিল?'

'তা আমি বলতে পারব না অরুণদা।' আমি জবাব দিলাম, 'আমরা এখানে পৌঁছবার পর দু'জনের মধ্যে গোপনে কিছু আলাপ অবশ্য হয়েছিল। বজরা থেকে নেমে শ্যামাপদবাবুকে

আসল কথাটি বলুন মিঃ টমাস।

এগিয়ে দিতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে টমাস সাহেবের গোপন আলাপের সুযোগ হয়েছিল।'

'তার আগে দুজনের মধ্যে পত্রালাপ হওয়াও সম্ভব। হয়তো দারোগাঠাকুরের ওপরওয়ালা ডি. এস. পি. সাহেবের কাছ থেকে কোনো চিঠি নিয়ে এসেছিলেন টমাস...'

আমরা টমাসের বজরাতে পৌঁছতেই সে রীতিমতো রুষ্ট স্বরে বললে, 'আমাকে আটকে রেখেছ কেন তোমরা? জান না, আমি একজন আর্মি অফিসার, যুদ্ধ-সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত আছি...'

টমাসের মুখের ওপরে অগ্নিদৃষ্টি হেনে অরুণ বললে, 'অষ্টভুজার মূর্তি নিয়ে পালিয়ে যাওয়া কি যুদ্ধ-সংক্রান্ত কাজ?'

'ও কি বলছ তুমি?' টমাস যেন আকাশ থেকে পড়লঃ 'অষ্টভুজার মূর্তিটিকে উদ্ধার করে আমি তার চোখে মণি দুটিকে বসিয়ে দিয়ে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছি, আর তুমি কিনা বলছ যে মূর্তিটিকে নিয়ে আমি পালিয়ে যাচ্ছি!'

'শ্যামাপদবাবুর সঙ্গে গোপন সুড়ঙ্গপথ দিয়ে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে মূর্তিটিকে বের করে নিয়ে এসেছেন, তাই না?'

'কি করে জানলে?' টমাস কম্পিত স্বর প্রশ্ন করে।

'মন্দিরের সন্ধান নিতে গিয়ে শ্যামাপদবাবুর ব্যবহার করা চন্দন ও ধূপধুনোর গন্ধ পেয়েছিল সঙ্কু ও নীলা। তাছাড়া আপনাদের কথোপকথন তাদের কানে এসেছিল। টাইম-বম্ব দিয়ে সুড়ঙ্গপথ ও গুহা-মন্দিরকে ধসিয়ে দিয়েছেন আপনি, মূর্তি উদ্ধার না হয়ে থাকলে কি আর করতেন এ কাজ!'

'টাইম-বম্ব দিয়ে আমি গুহা-মন্দিরকে ধ্বংস করেছি!' টমাসের চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে ওঠেঃ 'আমার নামে এমন সাঙ্ঘাতিক অপবাদ দিচ্ছ।'

টমাসের মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে অরুণ বললে, 'দিচ্ছি বইকি। এ ছাড়া আরও আছে। ঢিবির ওপরে সকালে যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল, সেটাও আপনি আর একটি সময়-বোমা দিয়ে ঘটিয়েছিলেন। গতকাল গভীর রাত্রে কিংবা আজ ভোরে ঐ ঢিবির মধ্যে বোমাটাকে পুঁতে রেখেছিলেন আপনি...'

'অপবাদের পর অপবাদ! কিন্তু এ কাজ যে আমি করেছি তা কি প্রমাণ করতে পার তোমরা?'

'বোধহয় পারি!' বলে পকেট থেকে দুটো ইস্পাতের টুকরো বের করে ডান হাতের চেটোর ওপরে রাখল অরুণ।

'ভালো করে দেখুন।' বলতে বলতে টমাসের দিকে এগিয়ে আসে অরুণ, 'ইস্পাতের টুকরো দুটি বিস্ফোরণের জায়গা থেকে পেয়েছি। দুটিতেই তারার চিহ্ন...'

'তাতে কি! তারার চিহ্ন থেকে কি কিছু বোঝা যায়!' বলে অরুণের মুখের ওপরে অগ্নিদৃষ্টি হানল টমাস।

মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে টমাসের আরও কাছে এগিয়ে এল অরুণ। হঠাৎ চিলের ছোঁ মারার ভঙ্গীতে টমাসের কোমরের বেল্টে লাগানো খাপ থেকে তার পিস্তল তুলে নেয় সে।

'এ কি, এ কি!' টমাস চিৎকার করে উঠল, 'ফেরত দাও আমার পিস্তল।'

'আপনাব পিস্তল কাকে বলছেন!' হাসতে হাসতে বললে অরুণ, 'এ তো আর্মির পিস্তল। সময়-বোমা, মানে টাইম-বম্বের ইস্পাতের টুকরো দুটির মতো এই পিস্তলটিও

তারার চিহ্ন বহন করছে। তারার চিহ্ন তো আপনাদেরই চিহ্ন—তাই না? আপনার পিস্তলের মতো সময়-বোমা থেকে ছিটকে আসা ইস্পাতের টুকরোয় এই চিহ্ন আছে, এর থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে এই পিস্তলের মতো বোমা দুটিও আপনারই ছিল...'

অরুণের কথার ওপরে কোনো কথা বলতে পারে না টমাস। তবে তার মুখের ভাবে বোঝা যায় যে মনে মনে রীতিমতো অস্বস্তিবোধ করতে শুরু করেছে সে।

পিস্তলটি নাড়াচাড়া করতে করতে অরুণ বললে, 'আমাকে সকলে বোমা-বিশারদ বলে জানে, বোমার মতো পিস্তলেও আমার সমান দক্ষতা। লোড্ করাই আছে দেখছি...'

সেফ্‌টি ক্যাচ্ খুলে ট্রিগারে আঙুল ছুঁইয়ে অরুণ বললে, 'এবার আসল কথাটি বলে ফেলুন মিস্টার টমাস। অষ্টভুজার মূর্তিটি এই বজরার মধ্যে আছে তো?'

'হ্যাঁ।' ঢোঁক গিলে জবাব দিল টমাস, 'মূর্তিটিকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে, ঠাকুরমশাই চোখ দুটিকে চোখের কোটরে বসিয়ে দিয়েছেন, এবারে মূর্তিটিতে স্থাপন করতে হবে...'

'তা করতে হবে তো আপনি বজরা ছেড়ে দেবার উদ্যোগ করছিলেন কেন? মূর্তিটিকে নিয়ে পালিয়ে যাবার মতলবে ছিলেন তো? স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে আপনার ঠাকুর্দার হস্তগত করা পাথরের চোখ দুটি নিয়ে খুশি থাকতে পারেননি আপনি, অষ্টভুজার মূর্তিটিকেও আত্মসাৎ করতে চেয়েছিলেন। চুরির মতলবে সাধুবেশে, অর্থাৎ আপনার ঠাকুর্দার অষ্টভুজার চোখদুটি হস্তগত করার পাপের প্রায়শ্চিত্তের ভান করে এসেছেন এখানে, ভাঁওতা দিয়েছেন সঙ্কুর জ্যাঠামশাইকে ও আমাকে। আপনার মতলব হাসিল করার জন্যই শ্যামাপদবাবুকে আপনার বাগে আনার প্রয়োজন ঘটেছিল। শেষ পর্যন্ত শ্যামাপদবাবু মূর্তি উদ্ধার করে বোধহয় খুব মোটা টাকার বিনিময়ে আপনাকে দিয়ে দিয়েছিলেন...'

নিমেষে ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে টমাসের মুখ, কোনো কথাই সে পারে না বলতে।

টমাসের চোখে চোখ রেখে অরুণ চাপা গম্ভীর গলায় বললে, 'এবারে বলুন, শ্যামাপদবাবুকে আবার ঐ মন্দিরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন কেন? শ্যামাপদবাবুর কাছ থেকে অষ্টভুজার মূর্তিটি পেয়ে কি আপনি তাঁকে প্ররোচিত করেছিলেন আবার মন্দিরে যাবার জন্য। শ্যামাপদবাবু মন্দিরে ঢুকলেন...তারপর বিস্ফোরণ ঘটল...ধসে চাপা পড়লেন শ্যামাপদবাবু...এর থেকে মনে হতে পারে...'

'যা মনে হতে পারে তা ভুল।' টমাস বাধা দিয়ে বললে, 'অষ্টভুজার মূর্তিটি মন্দির থেকে বের করে নিয়ে আসার পর শ্যামাপদবাবুর নির্দেশ অনুযায়ী আমি টাইম-বম্ব পুঁতে দিয়েছিলাম। অষ্টভুজার মূর্তিটি বের করে নিয়ে আসার পর শ্যামাপদবাবুর ভয় হয়েছিল যে, তুমি বা তাঁর মেয়ে মন্দিরের সুড়ঙ্গপথের হদিস পেয়ে ভেতরে ঢুকে দেখতে পাবে যে মন্দিরে দেবীর মূর্তি নেই। দেবীর মূর্তি না থাকলে মন্দির আর মন্দির থাকে না, কাজেই তিনি আমাকে মন্দিরটিকে ধ্বংস করে ফেলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। মন্দির থেকে বেরিয়ে আসার পর আমি শ্যামাপদবাবুর চোখের সামনেই টাইম-বম্ব পুঁতে দিয়েছিলাম সুড়ঙ্গের মুখে। অতএব, বিস্ফোরণ যে আসন্ন তা জেনেশুনেই তিনি আবার মন্দিরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন...'

'মিস্টার টমাস রাইট, আপনি বলতে চান যে, আত্মহত্যা করার জন্যই শ্যামাপদবাবু সুড়ঙ্গের মধ্যে আবার ঢুকেছিলেন...'

'হ্যাঁ। মূর্তি নিয়ে আমার বজরাতে আসার পর আমি যখন তাঁকে দশ হাজার টাকা দিলাম ঐ মূর্তির বিনিময়ে, তাঁর মনে প্রচন্ড অনুশোচনা হয়েছিল। আর্তস্বরে তিনি বলে উঠেছিলেন, এ আমি কি করলাম! টাকাটা তিনি ফেলে রেখে নেমে গেলেন বজরা থেকে। কোথায় গেলেন তা জানবার চেষ্টা করিনি, কারণ তখন আমি মূর্তিটিকে নিয়ে পালিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। পালাতে যে পারিনি তা তো দেখতেই পাচ্ছ। এখন বল আমাকে নিয়ে কি করবে তোমরা...'

'আপনি কি করেন তার ওপরেই নির্ভর করছে আমরা কি করব।'

'বল আমি কি করতে পারি...'

'প্রায়শ্চিত্ত। আপনার ঠাকুর্দা এবং আপনার নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত...'

প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন টমাস। জপসায় থেকে গিয়ে গড়ে তুলেছিল অষ্টভুজার নতুন মন্দির। তারপর শুভ দিনক্ষণ দেখে এই নতুন মন্দিরে অষ্টভুজা দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার আয়োজন করেছিল। এই অনুষ্ঠানে জপসা এবং আশেপাশের গ্রামের অনেকেই যোগ দিয়েছিলেন। জ্যাঠামশাইও উপস্থিত ছিলেন।